স্বপ্নের মতো

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

ম নী ষা

১৫ই আগস্ট ১৯৫৯
(স্বাধীনতা দিবস)

প্রকাশক ঃ
মণি সান্যাল
মনীষা গ্রন্থালয় (প্রাঃ) লিঃ
৪/৩বি বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলিকাতা-৭৩

মুদ্রক ঃ
শম্ভুনাথ চক্রবর্তী
লক্ষ্মী নারায়ণ প্রেস
৪৫/১/এইচ/১৪ মুরারী পুকুর রোড, কলিকাতা-৫৪

শ্রীরথীন বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রিয়বরেষু

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের অন্যান্য বই

নিঝুম রাতের আতঙ্ক

আনন্দমেলা

নিশিলতা

মায়ামৃদঙ্গ

বনের আদর

চৌরাবীপের ভয়ংকর

কাল রাতের ট্রেনে মোনা এসেছে। তার হাতে কিংসাইজ সিগারেটের প্যাকেট। কথায় কথায় 'উত্তমদা'র রেফারেন্স। এ মোনা সে-মোনা নয়, যে গুরুপদ মাস্টারের ভয়ে স্কুল ছেড়েছিল ক্লাস নাইনে। সামান্য তোৎলামিও ছিল। এখন আর বোঝাই যায় না। উড়ুক্কু চুলের জঙ্গল থেকে ভাপ বেরুনোর মতো সিগারেটের ধোঁয়া চুলবুল করে বেরুচ্ছে। দিলীপকুমারের ভঙ্গীতে আঙুলের ডগায় নাকের মাথা ঘষে দিয়ে বলল, আরতিদির সাজেশান, বুঝলি ? আমি নবাগতা কোন হিরোইনের বিপরীতে না থাকলে লাইন করতে পারবই না। নাম-করা নায়িকারা আমাকে ল্যাং মেরে খাটো করে দেয়। কিন্তু তেমন মেয়ে কোথায় ওয়েস্ট বেঙ্গলে ? সব তো খ্যাঁদানাকী।…

সবাই হেসে উঠল এ কথা শুনে। মোনার এক সময়কার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ গণা বলল, মাইরি! তুই সাউথে যা। সেখানেও কত সব বিউটিফুল মেয়ে আজকাল জন্মাচ্ছে। বেঙ্গলের হল কি বল তো ?

অংশু প্রতিবাদ করে মাথা দোলাল।—আই ডোণ্ট এগ্রি।

কিসে ?

ওই যে বলছিস, বাঙালী মেয়েরা সুন্দরী হয় না।

গণা রুখে বলল, তুই কচু বুঝেছিস। আমি বলছি…

তাকে থামিয়ে দীপু বলল, আসলে তা নয় রে। বাঙালীরা

কনজারভেটিভ। সুন্দরী মেয়ে জন্মালে তাকে আগলে রাখে পিদীমের মতো। এই দ্যাখ না, আপ-টু-ডেট ফ্যাশানের বেলা। অবাঙালীরা কত দ্রুত নতুন নতুন ফ্যাশানের ফ্লাডে ভেসে যায়। মেজরিটি বাঙালী সেই ট্র্যাডিশান্যাল আঁকড়ে আছে।

বিদ্যুৎ বলল, আসলে ফ্যাশান করার পয়সা নেই, তাই।

এ কথায় ফের হাসির ধুম পড়ে গেল। তারপর গণা লাফিয়ে উঠে হাত সামনে বাড়িয়ে বলল, ওয়েট ওয়েট ওয়েট। আমি ক্লিয়াব করে দিচ্ছি।

কিন্তু তার ক্লিয়াব করার আগে স্বয়ং হিরো বলে উঠল, ওই মেয়েটা কে রে ?

সঙ্গে সঙ্গে সবগুলো চোখ ঘুরে গেল রাস্তার দিকে।

হাল্কা ছিপছিপে গড়নের একটি মেয়ে আইসক্রিম চুষতে চুষতে আস্তে আস্তে পা ফেলে হাঁটছে। উদাসীন দুই চেরা চোখ ঘুরিয়ে একবার এদের দেখে নিল হয়তো। রুক্ষ চুল শেষ মার্চের এলোমেলো বাতাসে উড়ে মুখের পাশটা ঢেকে দিল। চুলগুলো নিশ্চয় আইসক্রিমের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছিল। তাই সে নাচের মুদ্রায় শরীব নাড়া দিল বার দুই।

তারপর এসে পড়ল একটা ঘূর্ণী নদীর দিক থেকে। ঘূর্ণীটা ধুলোবালি খড়কুটো শুকনো পাতার চরকি ঘোরাতে ঘোরাতে মেয়েটির ওপর ঝাঁপ দিল। সে এক সর্বনাশ।

বছরের এ সময়টা এই নেতাজী রোড মেয়েদের পক্ষে বেশ বিপজ্জনক। অথচ শহরের ধার ঘেঁষে নদীর পাড় বরাবর এমন সুন্দর রাস্তার একটা প্রচণ্ড আকর্ষণ আছে, অন্তত বিকেলের দিকে। রাস্তা দপ্তরের স্থানীয় কোন কর্তা প্রাণ ঢেলে একে সাজিয়ে গেছেন বৃটিশ আমলে। দু'ধারে কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, দেবদারু, অমলতাসের কারুকার্য। আর তার সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে সরকারী কোয়ার্টারগুলো, উকিলবাবুদের বাড়ি, এমন কি যেখানে পাজীর পা

ঝাড়া • বদমাসগুলোকে বেদম ঠ্যাঙানি দেওয়া হয়, সেই থানার আষ্টেপৃষ্ঠে লাল লাল বুগেনভিলিয়ার ছোপ। কবে যেন গণা বলেছিল, মাইরি, এখানে মার খেয়েও সুখ আছে। অবশ্য সেটা নিছক বুগেনভিলিয়ার খাতিরে নয়। অন্য কারণে। এবং আশ্চর্য ভাবে গণার মুখের কথাটা ফলে গিয়েছিল।

ঘূর্ণীর সঙ্গে মেয়েটির ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু হয়েছে। এক হাতে আইসক্রিম, অন্য হাতে সে নীল্‌চে ফিনফিনে শাড়ি খামচে এপাশে ওপাশে পাক খাচ্ছে। আঁচলের দিকটা ছড়িয়ে গিয়ে নীচু কলম আমগাছের ডালপালায় জড়িয়ে পড়ার তালে আছে।

পাঁচজোড়া চোখ ঘুলঘুলির মতো গোল হয়ে তাকিয়ে আছে তো আছেই।

বড় জোর তিরিশ সেকেণ্ডের ঘটনা। ঘূর্ণীর মাথাটা তখন হরিপদ উকিলের বাগানে ঢুকেছে এবং লেজের দিকটা রাস্তায় আরও একটু ভাঁড়ামি করে গেল। মেয়েটি গায়ে শাড়ি জড়াচ্ছে এখন হাতে আইসক্রিমটা উঁচু।

স্মার্ট মোনা একবার চটাৎ তালি বাজিয়ে হাসল। গণা ভুরু কুঁচকে চাপা গলায় বলে উঠল, এই হাসিস না। কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে।

বিদ্যুৎ ফিসফিস করে বলল, ভেরি ডেঞ্জারাস এলিমেণ্ট। তাকাসনে ওদিকে।

মোনা মফস্বলী বন্ধুদের হাবভাব দেখে দমে গেল। চাপা গলায় বলল, কে রে?

গণা গলার ভেতর জবাব দিল, মহী দারোগার মেয়ে।

মোনা বাঁকা ঠোঁটে তাচ্ছিল্য করে বলল, আই মিন, পুলিশ?

হুঁ।

তাতে কি হয়েছে? আমরা হাসতে পারব না তাই বলে? মোনা কিংসাইজ সিগারেট বের করে ঠোঁটে রাখল—তোরা মাইরি.

-যেন কি! পুলিশের মেয়ে কি পুলিশ? নাকি তোরা ক্রিমিন্যাল -যে এত ভয় পাস?

অংশু গম্ভীর হয়ে বলল, এখানে থাক না ভাই। মহী দারোগা কি জিনিস তো জানো না। মেয়েকে নিয়ে টণ্ট্‌ করেছ টের পেলেই পেঁদিয়ে লাট করে ছাড়বে। গণাকে জিজ্ঞেস করে দেখ না।

মোনা সিগারেট ধরিয়ে বলল, ফু ফু! ছাড় ও সব। কত পুলিশ দেখলুম!

মহী দারোগার মেয়ে তখন ফের আইসক্রিম চুষতে চুষতে থানা কোয়ার্টারের দিকে এগিয়ে চলেছে। মোনা ফিল্মী স্টাইলে সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে তাকে দেখছিল। ফের বলল, কি নাম রে?

গণা বলল, শ্রাবন্তী।

ইম্‌পসিব্‌ল!

কি ইম্‌পসিব্‌ল?

ওর নাম শ্রাবন্তী!

এতক্ষণে ফের সবার মুখে খোলামেলা হাসি ফিরে এলো। একটু আগে যা ঘটেছে তাতে নাড়িছেঁড়া হাসির চান্স বরবাদ হয়েছে, এখন সেটা উসুল করার ধূম পড়ে গেল। গণা বলল, হিরো মাইরি ওর প্রেমে পড়ে গেছে। শ্রাবন্তী নাম শুনে চোখ কপালে তুলে ফেলল, দেখছিস!

মোনা বলল, মোটেও না।

তবে ইম্‌পসিব্‌ল বললি যে?

তোদের মাথায় কিস্যু নেই। শ্রাবন্তী নামে একটি মেয়ে আইক্রিম খাচ্ছে—ভাবা যায়!

বিদ্যুৎ চারপাশটা সাবধানে দেখে নিয়ে বলল, ওকে আইসক্রিম খেতে দেখে যদি ভাবিস, চকোলেট প্রেজেন্ট করবি, মরবি মোনা! সাবধান! খুব সিরিয়াস মেয়ে কিন্তু।

মোনা ভিলেন চরিত্রাভিনেতা প্রাণের মতো দু'গালে ভাঁজ এঁকে ঠোঁটের কোণায় হেসে বলল, বাজী।

কিসের বাজী?

আমি ওকে সাকসেসফুলি চকোলেট অফার করব।

পাঁচ টাকা।

তোরা শুনলি তাহলে?

গণা ব্যস্ত হয়ে বলল, মোনা, ছেলেমানুষী করিসনে। তুই আজকাল এখানকার হালচালের খবর রাখিসনে, তাই বলছিস। ভীষণ বিপদে পড়ে যাবি। মহী দারোগার প্যাঁদানি যে খেয়েছে, সে জানে।

মোনা একটু দমে গেল। কিন্তু হাবভাবে আগের মতো তাচ্ছিল্য দেখিয়ে বলল, আরে বাবা, আমি তো তোদের মহী দারোগাকে চকোলেট অফার করতে যাচ্ছিনে, যাচ্ছি তার মেয়েকে।

দীপু অন্য দিকে তাকিয়ে ছিল। ঘুরে বলল, মেয়ে বাবার চেয়ে এককাঠি সরেস রে। তপুকে চিনিস তো? নগেন ডাক্তারের ছেলে। ধানবাদে ইঞ্জিনীয়ার হয়ে গেছে ও মাসে। শ্রাবন্তীর হাতে প্রকাশ্য রাস্তায় জুতোপেটা হয়েছিল। জিজ্ঞেস কর এদের। ওপেন মার্কেটে।

মোনা আরও ভড়কে গেল। বলল, কেন?

গণা চোখ নাচিয়ে বলল, ইভনিং শো ভেঙে বেরুনোর সময় ভিড়ে তপু নাকি ওর ব্যাক পোর্শানে চিমটি কেটেছিল। মাইরি!

আবার হাসি শুরু হল। শহরের ময়লা জলের যে বড় নালাটা রাস্তা পেরিয়ে নদীতে নেমে গেছে, তার কালভার্টে বসে পাঁচজন যুবক শেষ মার্চের বিকেলে মহী দারোগার মেয়েকে নিয়ে চাপা গলায় আলোচনা করতে থাকল।...

মোনার ভালো নাম মানস কুমার দত্ত। ফিল্মে বার দুই ছোটখাট রোল পেয়েছে, তাতে সে মানসকুমার। বছর তিনেক

কলকাতায় এক মাসির বাড়ি আছে। তার বাবা অধীর দত্তের এ মফস্বল শহরে মস্ত কারবার। আড়ৎ, তেলকল, পাম্পিং স্টেশন, ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর। তিন ছেলের মধ্যে মোনা ছোট। বড় রঞ্জন আর সেজ অমল বাবার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে আছে। ছোট মোনা যেন সংসারের খরচার খাতায় লেখা। ছোট বলেই তাকে বরাবর প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। তার আব্দার মেটাতে পিছপা হয়নি কেউ। বরাবর তার নেশা ফিল্মের। কতবার বোম্বে গেছে। ক্যাশ ভেঙেই গেছে। হন্যে হয়ে ফিরে এসেছে। তাতে বাড়ির কেউ তেমন কিছু রুষ্ট হয়নি। খোঁজাখুঁজিও অবশ্য করেনি। বছর তিনেক আগে মোনা কী ভাবে এক পরিচালকের নেকনজরে পড়ে যায় নাকি। সেই থেকে কলকাতায় গিয়ে আছে। মাসির বাড়ি বেনেপুকুরে। বনেদী পরিবার। বাড়িটা বড়। অনেকগুলো খালি ঘর পড়ে আছে এমনি এমনি। মোনা একটা ঘর পেয়ে গেছে। মাসির কাছে কদাচিৎ খাওয়া দাওয়া করে, বেশির ভাগ সময় বাইরে খেয়ে নেয়। জিজ্ঞেস করলে বলে স্টুডিওর ক্যান্টিনে খেয়ে নিয়েছি। বেলা অব্দি ঘুমিয়ে দশটায় সে বেরিয়ে যায়। ফেরে সেই রাত দশটা বাজিয়ে। মাসির পরিবারেও তার অস্তিত্ব কেউ গণ্য করে না।

কিন্তু টাকার অভাব হলেই মোনাকে বাড়ি আসতে হয়। এখন সে বাড়ি এসেছে টাকার যোগাড়েই।

রাতের ট্রেনে এসেছে। বাড়ির সবাই তখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাই খুব চেঁচামেচি করে ওঠাতে হয়েছে। বড় রঞ্জন শান্ত মেজাজের মানুষ। দেরী করে দরজা খুলে ঘুমঘুম চোখে দেখে নিয়ে শুধু বলেছিল, আজকাল এখানে খুব চুরি ডাকাতি হচ্ছে রে।

বাড়ি ঢোকার মুখে এমন উদ্ভুট্টে কথার মানে কি, মোনা বুঝতে পারেনি। তার পেটে তখন ক্ষিদে। ছ'ঘণ্টা ট্রেনজার্নির ক্লান্তি। রঞ্জনের বউ অমিতা অত রাতে স্টোভ ধরিয়ে আলুভাজা করে

দিয়েছিল। স্বামীর মতো শান্ত, গম্ভীর এবং ঠোঁটে একটুখানি মিষ্টি হাসি মাঝে মাঝে ঝিলিক দেয় তার। মোনার প্রশ্নের জবাবে জানিয়েছিল বড়দার এই অদ্ভুত কথার কারণটা আসলে কি।

অত রাতে আজকাল কেউ এখানে বাড়ি ফেরে না, অন্তত যার বাড়িতে পয়সা-কড়ি আছে। যে বাড়ি ফিরছে, তার পেছনে পেছনে ডাকাতেরা ওৎ পেতে চলে আসে এবং যেই না দরজা খোলা, অমনি বাড়ি ঢুকে পড়ে বোমা পিস্তল নিয়ে।

শুনে মোনা বাঁকা ঠোঁটে বলেছিল, যত সব মফস্বলী কারবার।

কলকাতা যাওয়ার পর থেকে এ শহরের লোকজন সম্পর্কে মোনার এই কথাটা একটা ধুয়ো হয়ে উঠেছে। অমিতা বেশি কথা বলে না। তাই তার প্রতিবাদ মোনা আশা করে না। কিন্তু মেজবউদি শান্তা অন্য ধাঁচের মেয়ে। সকালে চোখে ঝিলিক তুলে বলেছিল, কী ঠাকুরপো! কলকাতার লোকের মন তাহলে মফস্বলেই পড়ে থাকে!

মোনা বলেছিল, তার মানে?

মানে বোঝ না? শান্তা চাপা হেসে বলেছিল, দেব হাটে হাঁড়ি ভেঙে। বেশি চেঁচিও না। তোমার আসার খবর আমরা জানার আগেই 'মফস্বলী মাল'রা পায় কী করে?

মোনা আরও রাগ করতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গিয়েছিল। হেসে উঠেছিল হো হো করে। মেজবউদি কী বলছে, তা বুঝতে পেরেছে সে। মফস্বলী মাল কথাটা সে একজনের সম্পর্কেই বলে।

সরকারী হাসপাতালের নার্স অঞ্জলি রায়ের সঙ্গে নানা সূত্রে এ বাড়ির ভাব-টাব আছে। আর সেই সূত্রে তার মেয়ে গীতা অর্থাৎ সঙ্গীতারও যাতায়াত আছে। গীতার সঙ্গে মোনার একটু-আধটু প্রেম ভালোবাসা ছিল এক সময়। মোনা কলকাতায় গিয়ে ব্যাপারটা মন থেকে মুছে ফেলেছে কবে। কিন্তু গীতা ছাড়ে নি। মাঝে মাঝে

চিঠিপত্তর লেখে। তিন চারটে লেখার পর উত্যক্ত হয়ে মোনা একটা জবাব দেয়।

ক'দিন আগে মোনা তেমনি একখানা চিঠি লিখেছিল গীতাকে। জানিয়েছিল, শিগগির একবার বাড়ি যাবে হয়তো।

গীতার এক অদ্ভুত স্বভাব। মাঝে মাঝে এ বাড়ি এসে শান্তাকে মোনার খবরাখবর সে-ই জানিয়ে যায়। মোনা কোন্ ফিল্মে চান্স পাচ্ছে বা'পেয়েছে, কোন্ নায়ক বা নায়িকার সঙ্গে কোথায় আড্ডা দিয়েছে এবং কী সব কথাবার্তা হয়েছে, গীতা মুখস্থ করে নিয়ে শান্তাকে শোনায়।

গীতাকে যা জানায়, বন্ধুদেরও তাই সবিস্তারে জানায় মোনা। এটা তার অভ্যাস। মেজবউদির বিদ্যা হায়ার সেকেণ্ডারি। তাকে কিছু বোঝানো বৃথা। অবশ্য নিজের বিদ্যা যে মোটে ক্লাস নাইন অব্দি, সে কবে ভুলে গেছে। নিজেকে সে দস্তুরমত শিক্ষিত ছেলে মনে করে। কলকাতা এ তিন বছরে তাকে যথেষ্ট ইংরেজি শিখিয়েছে এবং সে মোটামুটি চালিয়ে যেতেও পারে। ভুল-ভাল নিশ্চয় বলে। কিন্তু এত দ্রুত বোলচাল চালায় যে ধরা কঠিন।

আসলে মোনার চেহারাটা সুন্দর। পোশাকে-আসাকে রগ্‌রগে ছিমছাম আধুনিকতা। কিন্তু সেটা ভিড়ে হারিয়ে যাবার মতো নয়, কারণ তার মধ্যে টলিউডী অর্থাৎ ফিল্মল্যাণ্ডের বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্য ভাষা দিয়ে বোঝানো যাবে না। অথচ মোনাকে দেখলেই চমকে তাকাতে হবে, মনে হবে, কোথায় কোন্ ছবিতে যেন এ মূর্তিটি দেখা।

রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে, এক ট্রাক ড্রাইভার ট্রাক থামিয়ে বলে গিয়েছিল, ক্যা তাজ্জব! হাম তো সমঝা, বিনোদ খান্না শুটিং করনে আয়া হিঁয়াপর!

হ্যাঁ, বিনোদ খান্নার আদল তার চেহারায় আছে এবং অতি যত্নে সে তাকেই ফুটিয়ে তুলেছে নিজের শরীরে। অথচ সে সুবিধে করতে

পারছে না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে মোনা ভাবে, শালা সবই লাক। লাক ফেভার করতে ক'দ্দিন লেগে যাবে কে জানে! সময় কি দ্রুত চলে যাচ্ছে স্রোতের মতো। কবে মেজদা বড়দার মতো শরীরের মাঝখানটা ঝুলে ও ফুলে বেকায়দায় পড়বে!

অতএব নিয়মিত ব্যায়াম করা দরকার। ভোরে ওঠা দরকার। অথচ ভোরের দিকেই ঘুমটা গাঢ় হয় এবং ন'টার আগে আগুন লাগলেও ওঠার সাধ্য নেই।...

মোনা এলেই গীতা এ বাড়ি আসে। প্রথমে কিছুক্ষণ অমিতা ও শান্তার কাছে গুলতানির পর শান্তার কোলের মেয়ে টুংকে নিয়ে দোতলায় ট্রেন দেখাতে যায়। বাড়ির কর্তা এবং তার দুই ছেলে আটটা বাজতেই ব্যবসার জায়গায় ছুটেছেন। বুড়োগিন্নি মোনার মা নীচে সংসারের খবরদারিতে ব্যস্ত। ওপরে টানা বারান্দার শেষে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের ঘরটা মোনার জন্য রাখা আছে।

তখনও মোনা বিছানা ছাড়েনি।

গীতা গিয়ে তাকে খোঁচাখুঁচি করে জাগায়। মোনা দুষ্টুমি করে হাত বাড়ালে গীতা পিছিয়ে আসে। এবং গীতার কোলে টুং।

তবে মোনার মনে সত্যি সত্যি আর গীতার জন্যে প্রেম নেই। এক সময় গীতার প্রতি সে তীব্র আকর্ষণ অনুভব করত। আজকাল তার গীতাকে কেমন সাদামাটা লাগে। জেল্লাহীন ক্ষয়াটে নিছক মফস্বলের মেয়ে। সে তুমি যতই সেজেগুজে থাক কিংবা স্টাইল মার, কিংবা স্মার্টনেস দেখাও! টলিউডী এক্সট্রারাও একেকজন একশো গীতার চেয়ে জেল্লাময়ী।

গীতা আজ এসে চটে গেছে মোনার নির্লিপ্ত ব্যবহারে। আগের মতো মোনা হাত বাড়ায়নি, ফিল্মীভাষায় বাতচিৎ করেনি। হিন্দী ফিল্মের প্রখ্যাত ডায়ালগ আওড়ায়নি। তারপর নিজের কৃতিত্বে হো হো করে হেসেও ওঠেনি।

নেহাৎ অল্প কথায় সেরেছে। তারপর সটান গিয়ে পাশের বাথরুমে ঢুকেছে। বারান্দায় টুংকে ট্রেন দেখাতে দেখাতে গীতার জীবনের অদ্ধেকটাই যেন কেটে গেল। বাথরুমের ভেতরে খালি জল পড়ার শব্দ। গীতার মাথার ভেতর যেন ঠাণ্ডা জল ঝরঝর করে গড়াতে গড়াতে অসহ্য লেগেছে, সে তখন সিঁড়ি ভেঙে নেমেছে। তারপর টুংকে নামিয়ে রেখে 'চলি মেজবউদি' বলে বেরিয়ে গেছে এ বাড়ি থেকে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে, জীবনে আর এ বাড়ি ঢুকবে না।

মোনার মা পছন্দ করেন না মেয়েটিকে। এলেই মুখটা তেতো করে রাখেন কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতেও পারেন না। তার প্রধান কারণ দুটো। একটা হল গীতার মা অঞ্জলি তাঁর অসুখ বিসুখে বড় সহায়। খবর পেলেই হল। দ্বিতীয়টা হল, মোনা কলকাতায় থাকে। ফিল্মলাইনে আছে সে। গীতার মতো মেয়েকে আর পাত্তা সে দেবে না। করুণা তা গভীর ভাবে বিশ্বাস করেন। মোনা তার পেটের ছেলে। মোনাকে তার চেয়ে বেশি কে চিনবে?

তাছাড়া মোনা তার ছোট ছেলে। মোনার প্রতিটি কথায় করুণার গভীর বিশ্বাস আছে। যখনই সে এসে টাকা চেয়েছে, স্বামীকে লুকিয়ে টাকা দিয়েছেন। তবে মোনার বাবা হিসেবী মানুষ। কিছু কিঞ্চিৎ কৃপণও। করুণা বেশি টাকা দিতে পারেন না ছোট ছেলেকে।

মোনা আসা মানেই করুণাকে কিছু টাকা দিতে হবে। করুণা তৈরি হচ্ছেন। কিন্তু বাড়ির বাকি সবাই মনে মনে ভারি সতর্ক। প্রতিবার মোনা আসে, আর অধীরবাবু দুই ছেলেকে ঠারেঠোরে ক্যাশ সম্পর্কে সাবধান করে দেন। মোনাকে বিশ্বাস নেই। রঞ্জন আর অমল নিজের নিজের বউকে সাবধান করে দেয়। আলমারির চাবি এবং গয়নাগাঁটির দিকে কড়া নজর রাখতে বলে।

মোনা কি এ সব টের পায়? তার হাবভাব দেখে মনে হয় না

তা। অথচ তার মনে খটকা যে লাগে না, এমন নয়। আজ বিকেলে বেড়াতে বেরুবার সময় অমিতাকে আলমারি খুলে শাড়ি গোছাতে দেখে ছিল। লকারটা খোলা ছিল। বারন্দা দিয়ে যাবার সময় মোনা যেই বলেছে, কী, শাড়ি চয়েস করা হচ্ছে নাকি বউদি? দেব চয়েস করে? অমনি অমিতার মুখে কেমন পাংশুটে ভাব লক্ষ্য করল এবং অমিতা লকারটা বন্ধ করে কেমন নার্ভাস গলায় বলল, না না। যাব কোন্ চুলোয় বল? পোকায় কাটল নাকি দেখছি। যা পোকার রাজত্ব তোমাদের বাড়ি! তারপর শুকনো হেসে বলল, তুমি যেদিন নিয়ে যাবে, সে দিন যাব।

মোনাও শুকনো হেসে বেরিয়ে গিয়েছিল।

তবে ও নিয়ে মাথাব্যথা করার পাত্র মোনা নয়। ছোটখাট ব্যাপারে সে চোখ রাখে না। কিছুই গ্রাহ্য করে না। পেট্রোল পাম্পে মেজদা থাকে। কদাচিৎ সেখানে একবার ঢুঁ মারলে ক্যাশবাক্সে চাবিটা ঘুরিয়ে তবে মেজদা কথা বলবে।

কিন্তু তাই বলে মোনা মুখ ফুটে টাকা চাইলে অমল দেবে না, এমন নয়। হয় তো বিশ পঞ্চাশ কমই দেবে। কিন্তু দেবে। মোনা এতেই খুশি।

সন্ধ্যায় নদীর ধারে ঘোরাঘুরির পর বন্ধুদের ছেড়ে মোনা অমলের কাছে গেল।

অমল রাত নটা, সাড়ে নটা অব্দি পাম্পে থাকে। তারপর ক্যাশ নিয়ে মোটর সাইকেলে বাড়ি ফেরে। পাম্প প্রায় সারারাত খোলা থাকে। কর্মচারী আছে।

অমল মোনাকে দেখে বলল, আয়। তোর প্রগ্রেস রিপোর্ট নেওয়া যাক।

অমল ছোট ভাইকে এ ভাবেই ঠাট্টা-তামাসা করে। মোনা খালি চেয়ারে বসে একটু হেসে বলল, ফিফটিন্থ এপ্রিল 'দিনান্ত' রিলিজ হচ্ছে, জানো?

অমল হাসতে হাসতে বলল, দিনান্ত মানে তোর সেই ছবিটা! ঠিক আছে। এখানে আসুক, তখন দেখে নেব তুই কী কেলোর কীর্তি করেছিস!

মোনা বাঁকা ঠোঁটে বলল, মাইনর রোল। স্কোপই পাইনি।

সে কী রে! তুই যে বললি ভিলেনের রোল পেয়েছিস!

গ্যাঁড়াকল। ডাইরেক্টর ভদ্রলোক অমন করে ঠকাবেন জানতুম নাকি?

অমল ভাইয়ের ব্যাজার মুখ দেখে সান্ত্বনা দিতেই বলল, যদি তোর ক্ষমতা থাকে, ওতেই লোকের চোখে পড়ে যাবি। তুই আমাদের সতুবাবুকে তো দেখেছিস! 'নিশির ডাকে' মাত্র একটুখানি রোল করেছিলেন—শুধু একটা ডায়ালগ : বাবু, আর কত রক্ত চাই? ব্যস! সে কী হাততালি! আসলে কী জানিস? ট্যালেণ্ট তো বটেই, সাধনা চাই। সতুবাবুর কাছেই শুনেছি, ওইটুকু ডায়ালগ রপ্ত করতে দিনের পর দিন কত সাধনা করেছেন।

অমল সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছে, নাকি নিছক ভণ্ডামি, মোনা বুঝতে পারে না। তবে মেজদা তাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে না, বরং ভাইয়ের জন্য তার গর্বই আছে। মোনা হো হো করে হেসে বলল, মেজদা! ডোণ্ট ফরগেট, ফিল্ম ব্যাপারটা তোমাদের এ সব মফস্বলী কারবার নয়। স্টুডিওর ফ্লোরে তো কখনও ঢোকনি। তোমাদের সতুবাবুকে বোলো না! ফ্লোরে ঢুকে যখন দেখবেন, চারদিক থেকে চোখ ধাঁধানো আলো এসে পড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে লেজ তুলে পালাবেন। ক্যামেরার সামনে অভিনয় অন্য জিনিস।

অমল বলল, এলি যখন, কয়েকটা দিন থাক্‌। তোর শরীরের হাল সুবিধে মনে হচ্ছে না। নিয়মিত খাওয়া-দাওয়া করিসনে মনে হচ্ছে। আরে, আগে তো শরীর, তারপর সবকিছু।

মোনা আচমকা বলল, মেজদা, শ' পাঁচেক টাকা দেবে?

অমল যথারীতি ধাক্কা খেল এবং সামলে নিয়ে এদিক ওদিক

তাকিয়ে গলার ভেতর বলল, এই তো ও মাসে আড়াইশো দিলুম। ব্যাপার কী রে তোর ?

খুব দরকার মেজদা। আপন গড।

অমল সন্দিগ্ধ চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, এত টাকা তুই কী করিস বল তো ? বাবা রেগুলার তোকে দুশো করে দিচ্ছেন। শুনেছি, মা-ও দেন মাঝে মাঝে। তুই বড়দার কাছেও তো নিস। এবং আমিও দিই। ফ্যাক্ট ?

মোনা মাথা দোলাল।

তোর এত টাকা লাগে কিসে ?

মোনা আহত ভাবে বলল, আমি ড্রিঙ্ক করিনে। রেসও খেলিনে।

অমল গলা চেপে বলল, আহা। আমি তা বলছিনে। মানে…

মোনা জেদ ধরে বলল, নো মোর টক। তুমি দেবে কিনা বল। না দিলে তাও খোলাখুলি বলে দাও। আমি তো ড্যাগার বের করে বসে নেই।

অমল আগের মতো গলার ভেতরে বলল, তুই একটা পাগল। উন্মাদ। ভাখ মোনা, তোর ফিল্মল্যাণ্ডের খবরাখবর আমারও মোটামুটি নানা সোর্সে জানা আছে। ও লাইনে নাকি বিস্তর ঠকবাজী হয়। তুই নির্ঘাৎ কোন ফ্রডের পাল্লায় পড়েছিস। খুলে বল্ তো, দিনান্ত না টিনান্তে একটুখানি রোল পেতে কত টাকা ঘুষ দিয়েছিস ? আই অ্যাম নাও সিরিয়াস, মোনা।

গতিক বুঝে মোনা ভড়কে গেল। কিন্তু সামলে নিয়ে বলল, ঘুষ বলছ, তাতে আমার আপত্তি আছে মেজদা। এ লাইনের প্রবলেম তো তুমি জানো না। দিনান্তের ডাইরেক্টরের কথা ছেড়ে দাও। ধর, এক সময়কার বিখ্যাত ডাইরেক্টর শম্ভুদার কথা। ভালো স্টোরি পেলেন। হাজার পঞ্চাশের একজন প্রোডিউসারও পেলেন। বিখ্যাত অভিনেতা অভিনেত্রীরা কম নিয়ে ওঁকে সাহায্য করতেও রাজী হলেন। অথচ ডিস্ট্রিবিউটার পেলেন না। একটুখানি ছবি

এগোবার পর টাকার অভাবে কাজ আটকে গেল। এখন শম্ভুদা যদি টাকা নিয়ে কাকেও চান্স দেন, দোষটা কোথায় তুমি বল? সেদিন দেখলুম, এক ভদ্রমহিলা আর ভদ্রলোক মেয়েকে নিয়ে হাজির। শম্ভুদাকে অফার দিলেন, এগারো হাজার টাকা দেবেন। মেয়েকে নায়িকা করতে হবে।

অমল বলল, বলিস কী! তারপর?

শম্ভুদা বললেন, তা হয় না। নায়িকার রোলে নাম-করা হিরোইন আছেন। তবে আপনার মেয়েকে সাইড রোল দিতে পারি। ভালো স্কোপ আছে। তবে হাজার কুড়ি দিতে হবে।

রাজী হল?

মোনা হাতের তালুতে আওয়াজ তুলে বলল, রাজী মানে? কৃতার্থ হয়ে গেলেন। আরে বাবা, মেয়েকে পর্দায় দেখবে লক্ষ লক্ষ লোক। কাগজে নাম বেরুবে। ভালো প্রোডিউসারের চোখে ধরলে ব্যস্, কেল্লা ফতে! এ কি কম কথা?

অমল হতাশ ভঙ্গীতে বলল, নেশা! আজকাল কী যে নেশা হয়েছে মাইরি! এই নেশায় সব বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যাচ্ছে!

মেজদা, পাঁচশো টাকা সামান্য। ভেরি স্মল অ্যামাউণ্ট।

অমল ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বলল, যেখানে বিশ হাজার দিচ্ছে লোকেরা, সেখানে তুই পাঁচশো টাকায় কী করবি রে হতভাগা?

মোনা একগাল হেসে বলল, তাহলে দাও না পাঁচ হাজার।

অমল হঠাৎ রেগে গেল।—তুই উন্মাদ! এ্যাদ্দিন যা দিয়েছি, দিয়েছি—বাবাকে হিসেব বুঝিয়ে দিতে হাজারটা মিথ্যে বলতে হয়েছে। তাছাড়া এ তো বিজনেসের টাকা। মোনা, আমার স্পষ্ট কথা শোন। নিজে এসে বসে আমাদের সঙ্গে বিজনেস কর। মানি আর্ণ কর। তারপর যেখানে খুশি ওড়াও।

মোনা মেজদার মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকল কয়েক

সেকেণ্ড। তারপর অভ্যাস বশে সিগারেটের প্যাকেট বের করেই দ্রুত পকেটে ঢোকাল। তারপর উঠে দাঁড়াল। বেরিয়ে গেল।

মোনা রাস্তায় গিয়ে সিগারেট ধরাল। শহরের এদিকটায় বসতী কম। পর্তুগীজ আমলের একটা গীর্জার পাশে খ্রীস্টান কবরখানা। তার পাঁচিলের গায়ে কিছু খাবারের আর চা পান সিগারেটের দোকান হয়েছে। এটার নাম স্টেশন রোড। একটু এগোলে হাসপাতাল এলাকা। হু হু বাতাস বইছে। সেই বাতাসে মোনার মনের ঝাঁঝটা একটু প্রশমিত হল। একবার ভাবল, গীতাদের কোয়ার্টারে যাবে নাকি? পরে ভাবল, কী হবে?

তারপর সে একটা সাইকেল রিক্‌শা ডেকে বাজার এলাকায় চলল।

করুণাময়ী ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্সে বড়দা রঞ্জন তখন সব সামলে-সুমলে বেরুবার জন্য ব্যস্ত। লম্বা দোকানের তিনটে শাটার পড়ে গেছে। একটা আদ্ধেক নামানো। মোনাকে দেখে রঞ্জন বলল, আয়। ঘুরতে বেরিয়েছিলি?

মোনা গলার ভেতর বলল, হুঁ।

এক মিনিট। একসঙ্গে বাড়ি ফিরব, দাঁড়া।

মোনা বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। একটু পরে শাটার নামানো হল। কর্মচারীরা তালা আঁটল। রঞ্জন সব ক'টা তালা টেনে পরীক্ষা করার পর বলল, হেবো, রিক্‌শা ডাক বাবা।

হেবো নামে ছোকরাটি রিক্‌শা ডাকতে যাচ্ছে, মোনা বলল, কী দরকার? এটুকু হেঁটেই যাই বড়দা। তারপর একটু হেসে চাপা গলায় ফের বলল, ভয় নেই। স্বয়ং ভিলেন আছে তোমার সঙ্গে, বড়দা।

রঞ্জন হাসল। বলল, থাক রে হেবো।

দু'ভাই পাশাপাশি হাঁটছিল। বাজার এলাকা। লোকজন হই-হল্লা আছে। রঞ্জন এই ভিড়ের অংশটায় তেমন ভয় পায় না।

ক্যাশের টাকা সন্ধ্যায় গোপনে তার বড় ছেলে রুণুর মারফত চালা হয়ে যায়। পরের অল্প স্বল্প যা থাকে, রঞ্জন নিয়ে যায়। রুণুর বছর দশেক বয়স। খুব চালাক চতুর ছেলে। স্কুলের ব্যাগে ক্যাশ নিয়ে যায়। আজকাল ডাকাতির ভয়ে সবাই সতর্ক।

অবশ্য রঞ্জন অনেক তদ্বির করে রিভলবারের লাইসেন্স জোগাড় করেছিল। সে ধুতি পাঞ্জাবি পরে। ভেতরের ফতুয়ার পকেটে ছোট অস্ত্রটা লুকানো থাকে।

এ খবর মোনা জানে। বাজার ছাড়িয়ে একটু ফাঁকা এলাকায় ক'বছর আগে নতুন বাড়ি হয়েছে তাদের। বাড়ির নাম 'কমলা নিবাস'। অধীরবাবুর মায়ের নামে নাম। কমলা সত্যি সত্যি কমলা ছিলেন। অধীববাবুর বাবা সাধুচরণ দত্তমশাই রাস্তার ধারে ছোট্ট তেচালায় বসে তেল নুন মশলাপাতি বেচতেন। নদীর ধাবে ধাঙড়বস্তীর লোকেরাই ছিল ওর বড় খদ্দের। সেই দোকানেব জায়গায় এখন করুণাময়ী স্টোর্স। লক্ষ টাকার মূলধন। মা কমলার আশীর্বাদ। তবে সেই আশীর্বাদের চোটেই ধাঙড়বস্তীটা যেন ধাক্কা খেয়ে পালিয়ে গেছে রেললাইনের কাছে। সে জায়গায় এখন হাল ফ্যাশানের বাড়ি ঝকমক করছে। কেয়ারী করা লন, ফুলবাগিচা, গ্যারেজে মোটর গাড়ি। অধীরবাবু অবশ্য মোটর গাড়ি কেনেন নি। তবে সম্প্রতি একটা জীপ কেনার কথা চলছে। ব্যবসা হচ্ছে আড়তের। নানা গ্রামগঞ্জের পাইকারী খদ্দের বাঁধা। আদায়পত্তরে একটা জীপ হলে সুবিধে হয়। মাঠ-ঘাট জল-কাদা ভাঙতে জীপের জুড়ি নেই।

বাজার ছাড়িয়ে গিয়ে মোনা বলল, বড়দা, খুব দরকার। শ'পাঁচেক টাকা দেবে?

রঞ্জন স্বভাবত শান্ত এবং একটু গড়িমসি প্রকৃতির। সহজে চমকায় না। ব্যস্ত হয় না। যাকে বলে দ্রুত রিঅ্যাক্ট করে না। কথাটা বলেই মোনা তাকিয়ে ছিল বড়দার মুখের দিকে। ল্যাম্পপোস্টের আলো উঁচু গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে পড়েছে। রঞ্জনের মুখের ওপর কুটিকুটি

ছায়া। চুপ করে আছে। তেমনি হাঁটছে। মাঝে মাঝে গলায় খুক করে একটু আওয়াজ।

মোনা ব্যাকুল হয়ে ফের বলল, দেবে বড়দা? তোমার দিব্যি, আর এক বছর টাকা চাইব না।

রঞ্জন চুপচাপ তো চুপচাপ। মোনার মনে রাগ ধোঁয়াতে শুরু করেছে। বাড়ির সামনা সামনি গিয়ে রঞ্জন শুধু বলল, বাবাকে বল না। দেবেন।

মোনা দাঁড়িয়ে গেল।—বাবা দেখালে বড়দা?

রঞ্জন গেটের রড ধরে ডাকল, বেচা রে।

অর্থাৎ বেচারাম। সে গেটের পাশের ঘরটায় থাকে। বাড়ির চাকর বলতে যা বোঝায়, তাই। ঠিক সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় গেটে সে তালা আঁটে। বাড়ির লোক সচরাচর ওপাশে বসার ঘর দিয়েই বাড়ি ঢোকে। কিন্তু রঞ্জন গেট দিয়ে ঢোকে। অভ্যাস। গেটের মাথায় অর্ধচন্দ্রাকার লোহার ফ্রেমে বুগেনভিলিয়ার ঝাঁপি আছে। মোনা একটা ফুলে টান দিয়ে ফের বলল, দেবে না তাহলে?

রঞ্জন তেমনি গলায় বলল, বাবা গার্জেন। তাঁকে বল।

মোনা অবাক হয়ে গেল। এমন নয় যে বড়দা কখনও তাকে টাকা দেয়নি। তবে সেজদার তুলনায় কম দিয়েছে এবং কদাচিৎ দিয়েছে। তার কাছে অবশ্য মোনা চাইতেও বরাবর সংকোচ বোধ করেছে। কিন্তু যখনই চেয়েছে কম বেশি কিছু পেয়েছে। আজ এমন জবাব শুনে সে অবাক।

গেটে রঞ্জন ঢুকে গিয়ে ঘুরে দেখল। তারপর ডাকল, আয়। তালা দেবে।

মোনার ইচ্ছে করছিল, বলে, বাড়ি ঢুকব না। কিন্তু টাকার যা তীব্র প্রয়োজন, মাথা ঠাণ্ডা রাখা দরকার। সে হন হন করে ঢুকে পাশ কাটিয়ে এগোল। তারপর বারান্দায় উঠে সিঁড়ি বেয়ে সোজা ওপরে নিজের ঘরে চলে গেল।

সুইচ টিপে আলো জ্বালাল। জানালাগুলো খুলে দিল। সিগারেট ধরিয়ে জানালার পাশে বসল। আশা নিরাশায় মনটা দুলছে। এমন করে মুখের ওপর চোট সে কোন দিন খায়নি।

একটু পরে পায়ের শব্দ হল বাইরে। করুণাময়ীর সাড়া এলো— মনু, এলি ?

মোনা মায়ের সামনে সিগারেট খায় আজকাল। বাবা দাদাদের সামনে নয়। ধোঁয়ার রিঙ পাকিয়ে বলল, মা, তোমার আম গাছে এবার গুটি ধরেনি ?

করুণাময়ী থপথপ করে হেঁটে ঘরে ঢুকলেন, দেখিসনি বুঝি ? অনেক গুটি এসেছে রে। রঞ্জু কি একটা ওষুধ এনে দিয়েছিল। বেচাকে দিয়ে স্প্রে করালুম। মুকুল ঝরে যাচ্ছিল, ভেবেছিলুম, এবারও নিষ্ফলা যাবে। যায়নি। বলে নীচু গদী-আঁটা চেয়ারটায় বসলেন। ফের হেসে হেসে বললেন, এবার তোকে আচার খাওয়াব। বর্ষা আসুক।

মোনা আন্ধার দেখিয়ে বলল, তুমি হাঁফাচ্ছ মা। কষ্ট করে উঠলে কেন ?

করুণাময়ী হাসলেন।—এলুম, তোর ঘরে সেই ও মাসে এসেছিলুম, তারপর এই এলুম। নোংরা হয়ে নেই তো ? কাল বরং মেঝেটা ধুয়ে দিতে বলব।

মোনা বলল, জানো মা, আমি এবারে একটা বিগ রোলে চান্স পাচ্ছি।

পাচ্ছিস বুঝি ?

হ্যাঁ। কিন্তু তার বদলে আমাকে ওয়ানফোর্থ কস্ট বিয়ার করতে হবে।

তাই বুঝি ?

করুণাময়ী অত কি বোঝেন। বরাবর এই জবাব তার। মোনা টাকার কথা তুলবে বলে তৈরি হল। কিন্তু হঠাৎ মেজবউদি শান্তা

পাশের ঘর থেকে এসে শাশুড়ীর সামনাসামনি খাটে বসে পড়ল।
মোনা রাগ চেপে করুণাময়ীকে তার ছবির গল্প শোনাতে শুরু করল।
শাস্তার এতে ভারি আগ্রহ। আসলে এজন্যেই তার আসা।......

॥ দুই ॥

মোনা এবার বাড়ি এসে ভাবগতিক টের পেয়ে নিরাশই হল শেষ পর্যন্ত। মায়ের কাছেও যে সুবিধা হবে না, সেটা আঁচ করেছে পরে মায়ের কথাবার্তায়। রঞ্জু অমল নাকি বউয়ের কথায় চলে। অধীরবাবু আবার ওদের ওপরই নির্ভরশীল আজকাল। বয়স হয়েছে। তার ওপর ইনকাম ট্যাক্সের ঝামেলা। উনি সংসারের সব কিছুই বোঝেন, খালি এই একেলে বিপত্তির সামনে ভ্যাবাকান্ত বনে যান। তাই রঞ্জু অমল যা বলবে বা করবে, তাই সই। আগের মতো নিজের কাছে ক্যাশ রাখেন না অধীরবাবু। তার ফলে করুণাময়ী যে পয়সা কড়ি সরিয়ে রাখবেন, তার উপায় নেই। সব চলছে পাই পয়সা হিসেবে।

এ সব শোনার পর মোনা মনমরা। পরের দিনটা বাড়ি থেকে বিশেষ বেরোয়নি এমন কি বিকেলেও বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা মারতে যায়নি। বাড়িতে ঘুরঘুর করেছে। মাঝে মাঝে মাথায় ঝিলিক দিয়ে উঠেছে পুরোনো রোগ।

অর্থাৎ আবার কি তাহলে ক্যাশ মেরে ভাগতে হবে? কিন্তু আজকাল মোনার মধ্যে আত্মসম্মান বোধ জেগেছে। নিজেকে আর ছোট করতে ইচ্ছে করে না। নৈলে দেরী সইত না। সেবারকার মতো ক্যাশ লুটে কিংবা অগত্যা গয়নাগাঁটি হাতিয়ে পালিয়ে যেতে তার গা ঘিনঘিন করে। সেবার হাজার তিনেক বাগিয়ে বোম্বাই পাড়ি দেবে ভেবেছিল। কলকাতায় গিয়ে প্ল্যান বদলায়। প্রথম

লাক ট্রাই টালিগঞ্জে। যাই হোক, সে আলাদা কাহিনী। মোনা আর টালিগঞ্জ থেকে বেরোতে পারেনি। এখনও পারছে না।

মোনা এবার যত অবাক হয়েছে, তত জেগেছে অস্বস্তি। তাদের পরিবারটা যেন একেবারে বদলে গেছে। কেমন একটা চাপা ধরনের স্বার্থপরতা ঘোঁট পাকাচ্ছে তলায় তলায়। অথচ বাইরে থেকে হাসিভরা মুখগুলো দেখে একটুও বোঝার উপায় নেই।

এই নতুন বাড়িতে আগের মতো ঘুপচি উঠোন নেই। উঠোন এবং লন ফুল বাগিচা মিলিয়ে যা দাঁড়ায় তাই। অনেকটা খোলামেলা জায়গা পাঁচিলে এবং দোতলা বাড়ি দিয়ে ঘেরা। পাঁচিলও যথেষ্ট উঁচু। তার ওপর কাঁটাতারের ফুটখানেক বেড়া। একাল সেকালে মেলানো ব্যাপার। মোনা ঠাট্টা করে বলেছিল, যমপুরী। আজকাল অত উঁচু পাঁচিল কেউ করে না। বারান্দা জুড়ে গ্রিল। সিঁড়ির মুখে গরাদ। যেন জেলখানা। ডাকাতের ভয়ে সারাক্ষণ এরা সতর্ক। সন্ধ্যায় মোনা কিচেনের বারান্দায় বউদিদের সঙ্গে জমিয়ে গল্প করছে, বেচু এসে বলল, ছোটবাবু, গণাবাবু ডাকছেন!

এখন গণাদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার মেজাজ নেই মোনার। সে বিরক্ত হল। বলল, বল শরীর খারাপ। শুয়ে আছে।

বেচু চলে গেল। গণা কেন, বাইরের পুরুষদের সচরাচর এ বাড়িতে ঢোকা মানা। বিশেষ করে গণার তো আরও বেশী করে মানা। ওর নাম শুনলে বাড়িসুদ্ধ তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে।

গণার বদনাম আছে শহর জুড়ে। তাকে সবাই ভয় পায়। গণার সঙ্গে মেলামেশা করেই যে মোনা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, এ বাড়ির সবার তা বিশ্বাস। ও ঘরের বারান্দা থেকে চাপা গলায় করুণাময়ী বললেন, সন্ধেবেলা কেন? মনু, যাসনে।

হেসে মোনা বলল, বললুম তো, শরীর খারাপ। শুয়ে আছি।

দুই বউদি হেসে উঠল একসঙ্গে। করুণাময়ী গলা আরও চেপে বললেন, গণা কী কীর্তি করেছে শুনিসনি মনু?

মোনা কান করে বলল, কী মা?

শান্তা রুটি বেলতে বেলতে চোখ নাচিয়ে বলল, ঠাকুরপোর সব তাতেই ন্যাকামি। প্রাণের বন্ধু। প্রাণের কথা বলতে আর বাকি আছে?

মোনা বলল, কী প্রাণের বন্ধু বলছ? জাস্ট ছেলেবেলায় মিশেছি। আমার বন্ধু তোমাদের মফস্বলী মাল! রক্ষে কর বাবা!

অমিতা সিরিয়াস ভঙ্গীতে বলল, ঠাকুরপো এখন কত হাই সোসাইটিতে মিশছে। গণা-টনাকে পাত্তা দেওয়া ঠিক না।

করুণাময়ী বিরক্ত হয়ে বললেন, নাও, তোমরাই ভাষণ দাও। আমি থামি।

শান্তা ঠাণ্ডা গলায় বলল, আপনারও কী হয়েছে যেন বাবা! ছেলের সঙ্গে ও সব কথা আলোচনা করতে যাচ্ছেনই বা কোন্ মুখে?

মোনাকে অবাক করে করুণাময়ী চুপ করে গেলেন। শান্তার কোলেরটাকে আদর দিয়ে একটু একটু তুলতে থাকলেন।

মোনা বলল, কী করেছে গণা, মেজবউদি?

অমিতা কয়লার উনুনের কাছে বসে রুটি সেঁকছে। আঁচের জন্যেই না কি, তার মুখটা ভীষণ রাঙা দেখাল। চাপা স্বরে সে বলে উঠল, ছিঃ! তোমরা অন্য কথা বল না! এই সাতসন্ধেয় ওই সব ফষ্টিনষ্টি!

মোনা কী বলতে যাচ্ছে, খানিকটা দূরে শিউলি ঝাড়ের ওদিক থেকে গণার গলা শোনা গেল, কী রে মোনা? তোর শরীর খারাপ নাকি?

বাড়িসুদ্ধু চমকে উঠেই কাঠ হয়ে গেল। মোনা মোড়ায় বসে ছিল। ভড়াক করে উঠে নীচে ঝাঁপ দিয়ে বলল, আয় গণা! মাইরি, মাথাটা বড্ড ধরে আছে। শুয়েই ছিলুম। জাস্ট এইমাত্র ওপর থেকে নেমে চায়ের জন্যে বউদিদের তোষামোদ করছিলুম। তারপর

সে এগিয়ে গিয়ে গণার হাত ধরে বলল, বাড়িতে বড্ড গুমোট।' চল্, বাইরে কোথাও গিয়ে বসি।

পিছনে অস্বাভাবিক গম্ভীর, হতবাক, অস্বস্তিকাতর বাড়ি রেখে দুজনে গেট পেরিয়ে রাস্তায় পৌছল। গেটের কাছে বিব্রত বেচু কাঁচামাচু মুখে তাকিয়ে আছে। সে জানে, এবার বিস্ফোরণ অনিবার্য এবং প্রথম চোটটা তার ওপর এসে পড়বে। কিন্তু সে কী করতে পারে? গেট সব সময় তালাবন্ধ থাকলেও মাঝে মাঝে নিজের দরকারে ঝট করে বেরুতে হয়। রাস্তার ওপারে পানের দোকান আছে একটা। বেচু বিড়ি কিনে ফিরে আসছিল। এমন সময় গণা হাজির। তার মুখের ওপর তালা আটকানো উচিত মনে করেনি বেচু।

মোনা গণাকে একটা সিগারেট দিয়ে বলল, দুপুরে ঘুম থেকে ওঠার পর দেখি মাথাটা বেজায় ধরেছে। আমি পেনকিলার খাওয়া পছন্দ করিনে।

গণা মিটিমিটি হাসছিল। রাস্তার আলোর ছটা তার মুখে পড়েছে। মোনা লাইটার জ্বেলে সিগারেট ধরিয়ে দেওয়ার পর জোর একটা টান দিয়ে ধোঁয়ার সঙ্গে সে বলল, এই! তুই মাইরি বাজী জিতে যাচ্ছিস!

মোনা ভুরু কুঁচকে বলল, জিতে যাচ্ছি মানে?

মানে, সেই যে বাজী!

বাজী! কিসের বল্ তো? বলেই মোনার কথাটা মনে পড়ে গেল। সে হাসল। মাই গুডনেস! ছ্যাট পুলিশ গার্ল!

গণা খিক খিক করে হাসল।—ফুলিশ বললি, না পুলিশ বললি রে? যাক্ গে, গুড নিউজ। মহী দারোগার মেয়ে নাকি অংশুর বোন জলিকে তোর কথা জিজ্ঞেস করেছে। আয়, সেলিব্রেট করবি।

মোনা ধোঁয়ার রিং পাকিয়ে সেগুলোর দিকে চোখ রেখে বলল, এতে এক্সাইটেড হবার কী আছে? তোরা মাইরি সত্যি মফস্বলী মালই থেকে গেলি!

গণা ধমকের সুরে বলল, পেঁয়াজী করিসনে মোনা! তোদের টালিগঞ্জ চুঁড়ে এমন জিনিস মিলবে না। তুই তো পুরোটা শুনিসনি। গোটাটা শোন।

মোনা তাকাল।

জলি তো তোর পরিচয় ভালো ভাবেই দিয়েছে। তোর 'দিনান্তে'র রোলটার কথা বলেছে। শুনে-টুনে শ্রাবন্তী কী বলেছে জানিস? বলেছে, আমারও তাই সন্দেহ হচ্ছিল চেহারা দেখে। শেষে জলিকে ধরেছে, আলাপ করিয়ে দিতে হবে। কিন্তু জলি তো তোদের বাড়ি যায়-টায় না। তোর মেজবউদি কবে কী যেন বলেছিল।

একদমে কথাগুলো বলে গণা ওর দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসতে থাকল।

মোনা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বাঁকা ঠোঁটে বলল, এর জন্যে তোরা একেবারে নেচে উঠেছিস! ভ্যাট্!

দার্শনিকের ভঙ্গীতে গণা বলল, শ্রাবন্তীর মতো বিউটিফুল মেয়ে পৃথিবীতে কমই জন্মায়, মোনা। তুই না হয় টালিগঞ্জে ঘুরিস। কিন্তু আমরাও তো বিস্তর বিউটিফুল মেয়ে দেখেছি। সিনেমায় দেখেছি। আমাদেরও কনসেপশান আছে।

বাজে কথা বলিসনে। এই যে তুই সেদিন বললি, বাঙালী মেয়েরা থ্যাঁদানাকী। শ্রাবন্তীকে ছাখ। দেখে তারপর কথাটা বল, দেখি কেমন তোর চোপা!

মোনার মনটা হঠাৎ ভালো হয়ে গেল। গণার একটা হাত টেনে নিয়ে বলল, আয়, কিছুক্ষণ ঘুরে আসি।

গণা পা বাড়িয়ে বলল, ঘুরবি কোথায়? চল, ক্লাবে সবাই বসে আছে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মোনা চলল। ক্লাব মানে, নেতাজী ক্লাব। এ শহরে নেতাজী নামে অনেক কিছু আছে। কবে যেন একবার জনসভায় এসেছিলেন, এ শহরে। সেই স্মৃতি তো বটেই, তার ওপর বাঙালী নেতাজী-অন্ত প্রাণ।

গণাদের নেতাজী ক্লাবটা সতু কোবরেজের বাড়িতে। রাস্তার ধারে পাশাপাশি দুটো ঘর। একটা ঘরে জয় মা কালী আয়ুর্বেদ ভবন এবং তক্তাপোষে আড্ডার ব্যবস্থা আছে। সেখানে চুটিয়ে জ্যোতিষচর্চা হয়। পাশের ঘরটা খালি পড়ে ছিল। সতুবাবুর মেয়ের সংখ্যা সাত। ছোটটি বাদে সবাইকে পার করে দিয়েছেন শ্বশুর-বাড়িতে। বাড়িতে ঘরের সংখ্যাও কমপক্ষে খান পাঁচেক। কিছু ভাড়া দিয়েছে। নীচে ওই ঘরটায় এক হিন্দুস্থানী তামাকের দোকান করেছিল। ডাকাতে তার গলা কেটে ফেলে। সেই থেকে ঘরটা খালি পড়ে ছিল। ভূতের ভয়ে কিংবা পাড়ার ছেলেদের মতলবী চক্রান্তে ওখানে কেউ ঢুকতে সাহস পায়নি। কাজেই সতুবাবুকে পটিয়ে হাত করেছে গণারা।

এতে সতুবাবুরই উপকার হয়েছে। দাপট দেখাতে ছাড়েন না লোককে। এতগুলো জঙ্গী ছেলে তাঁর হাতে এখন।

কিন্তু ক্লাব মানে দুটো ক্যারাম বোর্ড বয়স্ক 'যুবক' কয়েকজন জুটেছেন পরে, তাঁদের জন্যে তাস, ফুটবল, ক্রিকেট আর ব্যাডমিন্টনের সরঞ্জাম, একটা মস্ত সতরঞ্চী, আর কোণার দিকে পুরো শোলার তৈরি স্থায়ী মা সরস্বতী। এ শহর একদা শোলার কাজের জন্যে বিখ্যাত ছিল।

দুর্গাপুজো করার সামর্থ নেই ক্লাবের। তবে ওই সময় থিয়েটার দু'রাত্তির বাঁধা। আজকাল মেয়ে চরিত্রে অভিনেত্রী পাওয়া যায়। খরচাটা তাই বেশিই হয়। নদীর ওধারে কলোনীতে দুই বোন মরশুমে এলাকার যাত্রা-থিয়েটারে অভিনয় করে একতলা বাড়ি বানাতে পেরেছে।

মোনার অভিনয় ক্ষমতা এই ক্লাবের থিয়েটারেই দেখা গিয়েছিল। বরাবর সে ভিলেন চরিত্র করে নাম কুড়িয়েছে। সত্যি বলতে কী, সেই থেকে তার মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা দানা বাঁধতে শুরু করেছিল। তখন বিনোদ খান্নার নাম কেউ শোনেনি। নাহলে মোনার বিনোদ খান্না নাম তখনই চালু হয়ে যেত।

সন্তু কোবরেজের বাড়ির সামনে রাস্তা। তার ওপারে খানিকটা পোড়ো জায়গা। ভাঙা মোটর গাড়ির লোহালক্কড়ে জং ধরে পড়ে আছে। ইঞ্জিনের ছ্যাঁদা দিয়ে আগাছা গজিয়েছে। কোন মারোয়াড়ীর কেনা জায়গা। এতে একটা সুবিধে হয়েছে ক্লাবের। থিয়েটারের স্টেজ ওখানেই হয়। রাস্তা অব্দি লোকজন বসে। তাছাড়া একটু দূরে নদী। হাওয়া আসে শনশনিয়ে। ক্লাবের বারান্দায় গ্রীষ্মে অনেকটা রাত অব্দি আড্ডা চলে। সেই আড্ডার কী টান ছিল মোনার মনে।

আজ সব অকিঞ্চিৎকর লাগে। এই যে মোনা এখন ক্লাবের দিকে যাচ্ছে, তার বরং বিরক্তিই জাগছে। কী খালি ভ্যাজর ভ্যাজর এঁড়ে তক্কো, কখনও খেলাধূলো, কখনও ফিল্ম নিয়ে। কুয়োর ব্যাঙের মতো মফস্বলী ছেলেগুলো গ্যাস ঝাড়ে। মোনা বলল, এই গণা, যাচ্ছি বটে। কিন্তু বেশিক্ষণ বসব না।

গণা শুধু বলল, আয় না।

রাস্তার বাঁকে সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। মোনা বলল, কী?

এক মিনিট দাঁড়া। দেখি, জলি আছে নাকি। ও আবার কোথায় যেন টিউশানিতে যায়।

গণা গলিতে ঢুকে গেল। তারপর একটু পরে সে জলিকে সঙ্গে নিয়ে ফিরল। জলি গাব্দাগোব্দা মেয়ে। গায়ের রঙ যাকে বলে শ্যামবর্ণ। ভারি অমায়িক হাসিখুশি মেয়ে। অংশুর চেয়ে বয়েসে নাকি এক বছরের ছোট। সে হাসতে হাসতে এবং কতকটা হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বলল, কথা বলব না মোনাদা! আড়ি নাও। আগে আড়ি নাও, তারপরে অন্য কিছু!

মোনা মেয়েদের সামনে ফিল্মী স্মার্টনেস দেখাতে অভ্যস্ত। সেই ভঙ্গীতে বলল, এসো জলি। কেমন আছ?

আমাদের বাড়ি আসেননি কেন, তাই বলুন আগে।

মোনা হাসল।—আসব'খন। আছি কয়েকদিন।

জলি এক পা এগিয়ে বলল, আসব'খন নয়। এখুনি আসতে হবে। জানেন, আমরা সব সময় আপনার কথা বলি।

গণা বলল, এই জলি! এখন নয়। তোকে যেজন্যে ডাকলুম, বল মোনাকে।

জলি এদিক ওদিক দেখে নেওয়ার ভঙ্গী করে দুষ্টু হেসে চাপা গলায় বলল, মোনাদা! শ্রাবন্তী আপনার সঙ্গে আলাপ করার জন্যে পাগল, জানেন?

মোনা ন্যাকামি করে গম্ভীর চালে বলল, শ্রাবন্তী! কে সে?

গণা ওর পিঠে থাপ্পড় মেরে বলল, টালিগঞ্জী কায়দা দেখাসনে মোনা! খুব হয়েছে। শোন্, জলি যা বলছে।

জলি মুখ টিপে হেসে বলল, আপনি কাল মর্নিংয়ে আসুন মোনাদা। শ্রাবন্তী আমাদের বাড়িতে আসবে। আমি ওকে আসতে বলেছি। বলেছি, মোনাদাও আসবে। তখন আলাপ করিয়ে দেব।

মোনা ডাঁট দেখিয়ে বলল, শ্রাবন্তী কী এমন মেয়ে যে তার সঙ্গে আলাপ আমাকে করতেই হবে!

জলি বলল, আহা! আপনি কেন, ওই তো আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চায়।

কেন?

জলি ভ্যাবাচাকা খেল। গণা রেখে ফোঁস করে উঠল, তুই মাইরি ভীষণ ডাঁটিয়াল হয়ে গেছিস মোনা। অতি দর্পে হত লঙ্কা। মনে থাকে যেন।

মোনা শুকনো হেসে বলল, ঠিক আছে। জলির খাতিরে।

জলি উৎসাহে বলল, দেখবেন মোনাদা, যেন ডোবাবেন না। শ্রাবন্তী ভারি রগচটা মেয়ে।

মোনা ওর কথার ওপর বলল, এবং পুলিশ অফিসারের মেয়ে। সারা টাউন যার দাপটে ঠকঠক করে কাঁপে।

জলি খিলখিলিয়ে বলল, যাঃ! সেজন্যে না। শ্রাবন্তী সত্যি অন্য ধরনের।

আরও কয়েকবার সকালে আসার কথা স্মরণ করিয়ে জলি চলে গেল। গণা পা বাড়িয়ে বলল, তোকে রাইট টাইমে আমি ডেকে নিয়ে আসব। তবে আমরা কেউ থাকব না, বুঝলি তো? মহী দারোগার রাগ আছে আমার ওপর। তোকে কথাটা বলা হয়নি এখনও।

মোনা হাঁটতে হাঁটতে আনমনে বলল, কী ব্যাপার?

গত মাসের কথা। সে এক কেলেঙ্কারি মাইরি। সন্ধ্যেবেলা নদীর চরে ঘুরতে গিয়েছিল শ্রাবন্তী। একা। কারা নাকি ওকে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল। কেন যাচ্ছিল, বুঝতেই পারছিস। বাবা! দারোগার মেয়ে! আঁচড়ে, কামড়ে পালিয়ে আসে।

মোনা চমকে উঠল।—মাই গুডনেস!

আপন গড। আমি সেদিন ছিলুমই না। কলকাতা গিয়েছিলুম। ফিরে এসে সব শুনলুম।...গণা দাঁড়াল। হিসহিস করে বলল ফের, আমি মাইরি কিছু জানিনে। আমাকে মহীশালা অ্যারেস্ট করে নিয়ে গিয়ে খামোকা রামপ্যাঁদান প্যাঁদাল! খামোকা! আপন গড!

মোনা হো হো করে হেসে উঠল। তারপর গণার কাঁধে হাত রেখে বলল, ভুলে যা!

গণা গুম হয়ে হাঁটতে থাকল। মোনা টের পেয়েছে, গণার বুকের তলায় কষ্টটা আটকে আছে। থাকারই কথা। মেয়েঘটিত ব্যাপারে ছেলেদের প্যাঁদানি খাওয়ার কথা শুনলে মোনার মাথাতেও খুন চড়ে যায়। তবে এই গণার হিসট্রি অন্য রকম। গণা বিস্তর জায়গায় প্যাঁদানি খেয়েছে বরাবর। দিতে পেরেছে তার তুলনায় অতি সামান্য। আসলে গণার বাবার পয়সাকড়ি নেই। গরীব ফ্যামিলি। বন্ধুরা বাদে গণার পক্ষে কথা বলার লোক নেই এ শহরে। কিন্তু বন্ধুরাই বা কি করতে পারে গণার জন্যে? প্রত্যেকের গার্জেন

চটা। ছাত্র হিসেবে কেউ ভালো ছিল না। টেনে-টুনে কেউ স্কুল-ফাইনাল, কেউ কলেজে কিছুদিন ঢুকেই বেরিয়ে এসেছে। শুধু অংশু বাদে। অংশুদের বাড়িতে বরাবর পড়াশুনার চাপ বেশি। ওর বাবা স্কুল টিচার বলেই হয়তো এমনটা হয়েছে। অংশু আর তার বোন জলি বি-এ পাশ করে ফেলেছে। আর লেখাপড়ায় গণা মোনার চেয়েও খাটো। ক্লাস সিক্স অব্দি বিদ্যে। তাই বলে গণাকে ধরা কঠিন। দরকার হলে সে মোনার চেয়েও বেশি ইংরেজি শব্দ আওড়াতে পারে। যে যত বেশি ইংরেজি শব্দ আওড়ায়, সে-ই তো বেশি শিক্ষিত।

ক্লাবের বারান্দায় অংশু দীপু বিদ্যুৎ আর এক অচেনা যুবক ব্রিজ খেলছিল। গণা বারান্দায় উঠে সতুবাবুর ঘরের দিকে হাঁক ছাড়ল, মেনী! এ্যাই মেনী!

সতু কোবরেজের ছোট মেয়ে মেনী তক্তাপোষের কোণায় বসে অঙ্ক কষছিল। সতুবাবু আর তাঁর দুই বন্ধু অন্য পাশে একটা খবরের কাগজের দিকে ঝুঁকে ভাঙা তিনটি গম্বুজের মতো কাত হয়ে আছেন। মাঝে মাঝে এক বন্ধু, রিটায়ার্ড পোস্টমাস্টার জগমোহন ঘুরে মেনীর উদ্দেশ্যে বলছেন, পারলি? মেনীর জবাব নেই। এ হেন সময়ে গণাদার হাঁক মানেই মুক্তি। কোবরেজ মশাই গণাকে বড্ড ভয় পান। খাতির করেন প্রচণ্ড। মেনী চিল চ্যাঁচানি চেঁচিয়ে বলল, যাই গণাদা! তারপর বেরিয়ে এসে বারান্দার চল্লিশ ওয়াটের বাল্বের আলোয় মোনাকে দেখে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। গণা চাপা গলায় বলল, বেশি না, মাত্র এক কাপ চা। মোনার অনারে। বুঝলি তো? ঝটপট!

মেনী মোনার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে তাকাতে পা এগোতে গিয়ে হোঁচট খেল এবং চলে গেল। মোনা তাসের আসরের কোণায় পা নীচে ঝুলিয়ে বসে পড়ল। অংশু হেসে বলল, আয়।

দীপু ইস্কাবনের সাহেব চিতিয়ে ফিক করে হাসল।—এবার? পথে এসো বাছাধন। তারপর মোনার দিকে ঘুরে বলল, সারাদিন কোথায় ছিলিস রে?

বিহ্যুৎ চাপা গলায় বলল, মহী দারোগার মেয়ের জন্যে চকোলেট কিনতে গিয়েছিল কলকাতা। ওর যেমন টলিউডী সিগারেট, তেমনি টলিউডী চকোলেট থাকতে নেই বুঝি?

অংশু চোখ টিপে নবাগতকে দেখিয়ে বলল, সব সময় জোক ভালো না। মোনা আলাপ করিয়ে দিই। আমাদের সিঙ্গিমশায়ের জামাই। আর এ সেই ফেমাস মোনা, যার কথা আপনাকে বলছিলুম জামাইবাবু।

যুবকটির গায়ে গরদের পাঞ্জাবী, সোনার বোতাম, সোনার চেন—অর্থাৎ জামাইবাবু ফুলবাবুতে মেশা কমনীয় তুলতুলে চেহারা মোনাকে ওই রকম কিছু আঁচ করিয়েছিল।

সিঙ্গিমশায়ের জামাইবাবু তাস সমেত হাত জোড় করে মিঠে হেসে বলল, আমি ষষ্ঠীচরণ বোস। আপনার কত নাম শুনেছি। পরম সৌভাগ্য, আলাপ হয়ে গেল। আপনি হলেন গিয়ে ছায়াছবির লোক।

ষষ্ঠীচরণ বিনয়ী বটে। মোনাই একটু হাসল। ডাঁটের হাসি।

ষষ্ঠীচরণের আর তাসে মন নেই। বলল, আপনাদের লাইনে আমার বড্ড 'ইণ্টারেস' বুঝলেন মোনাবাবু?

মোনার প্রেস্টিজে লাগল। বলল, আমার নাম মানসকুমার। ফিল্ম ম্যাগাজিনে দেখে থাকবেন।

ষষ্ঠীচরণ কি হাতড়ানোর ভঙ্গীতে চোখ পিটপিট করার পর ফ্যাঁচ করে হেসে বলল, তাই আপনাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে অত চেনা চেনা লাগছিল। তাই বটে। কি সৌভাগ্য। কি সৌভাগ্য।

বিহ্যুৎ অংশু চোখাচোখি করে আড়ালে হাসছে। গণার মুখ আকাশে তোলা। গম্ভীর। মোনা বলল, তোরা এখনও তাস পিটিস।

তাস পিটবে তো ট্রেনের ডেলি প্যাসেঞ্জাররা! যত সব মফস্বলী কারবার তোদের! ফ্রাশ খেললেও বুঝি একটা মানে আছে।

দীপু বলল, আয় না, খেলি।

মোনা বলল, তোদের আইডিয়া নেই। সুপারস্টার হোটেলে এই তো সেদিন তখন রাত প্রায় দশটা, অমিতাভজী এসেছেন মেট্রোয় একটা ছবি রিলিজ উপলক্ষ্যে, তো…

ষষ্ঠীচরণ বলল, অমিতাভ বচ্চন?

আবার কে? মোনার জবাব শুনেই ষষ্ঠীচরণ চোখ নাচিয়ে হাসল। মোনা বলল, ফের, তো উত্তমদার সঙ্গে গাড়িতে যাচ্ছি। হঠাৎ রিং হল।

অংশু মুখ তুলল। বিদ্যুৎ বলল, রিং? মানে ফোন? গাড়িতেই?

মোনা বেকায়দায় পড়েই সামলে নিল।—আজ্ঞে হ্যাঁ। থাক তো মফস্বলে। খোঁজখবর রাখ না। ফিল্মস্টারদের গাড়িতে শুধু নয়, আজকাল বড় বড় ইণ্ডাস্ট্রীয়ালিস্টদের গাড়িতেও ফোনের এ্যারেঞ্জমেণ্ট আছে।

অংশু বলল, সে তো বিদেশী ফিল্মে দেখেছি। চলন্ত গাড়িতে বসে ফোন করছে।

মোনা বলল, রেডিও সিস্টেমের ফোন। আমাদের দেশে রিসেণ্ট্‌লি হয়েছে।

ষষ্ঠীচরণ তাস ফেলে নড়ে বসল।—মানসকুমারবাবু, আপনার সঙ্গে কোন্ কোন্ স্টারের আলাপ আছে, ওনাদের কথা একটু বলুন না শুনি। গাঁয়েগঞ্জে পচে মরছি। এ সৌভাগ্য তো সব সময় হবে না।

মোনা আগ্রহী শ্রোতা পেয়ে জমে গেল। তাসের আসর পণ্ড। অংশু বিরক্ত হয়ে অন্য দিকে ঘুরে ঠ্যাঙ নাচাতে থাকল। দীপু আর বিদ্যুতের অবশ্য কান খাড়া। গণা তেমনি চুপচাপ আকাশ দেখছে। খানিক পরে গণা ঘুরে বলল, দাঁড়িয়ে আছিস, আর ডাকছিস না? কই দে। ঠাণ্ডা করে ফেললি বুঝি?

মেনী চা এনে পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল। চায়ের কাপ প্লেট দিয়ে বলল, জামাইবাবুর জন্তেও চা করেছে মা। আনব?

সবাই হেসে উঠল। গণা চোখ পাকিয়ে বলল, আনব কি রে? তুই মাইরি···

মোনা সুন্দর ফিল্মী চোখ তুলে বলল, মেঘে ঢাকা তারা।

মেনী রাঙা হয়ে চলে গেল। ষষ্ঠীচরণ ফ্যাঁচ করে অদ্ভুত হেসে বলল, উরেব্বাস! আবার একবার বলুন, আবার একবার বলুন। লোকে তো এমনি এমনি টিকিট কেটে বই দেখতে যায় না।

চায়ের সঙ্গে মোনা দ্বিগুণ উৎসাহে সিনেমায় ফিরে গেল। এ তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। বলতে শুরু করলে দারুণ জমিয়ে দেয়। তার ফাঁকে ফাঁকে একটি করে জুতসই ডায়ালগ এবং পোজ। শিমূলতলায় শুটিংয়ে গিয়ে আরতিদি কিংবা সুপ্রিয়াদি কিংবা অপর্ণাদি কী বলেছিলেন তাকে, কবে উৎপলাদা তার পেটে খোঁচা মেরে বলেছিলেন, সাবধান, অর্থাৎ ভুঁড়ির দিকে নজর রাখো, তারপর ফ্লোরে ভুল ডায়ালগ বলে কোন্ নবাগতা পরিচালকের ধমক খেয়ে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলেছিল···সে এক মায়াজগতের কাণ্ড-কারখানা। আর মোনা ক্যারিকেচারেও বরাবর পারদর্শী। স্কুলে গুরুপদ মাস্টারের ক্যারিকেচার দেখাতে গিয়েই তো বিদ্যার দফারফা।

ঘণ্টাটাক পরে দেখা গেল। সিঙ্গিমশায়ের জামাই ষষ্ঠীচরণ মোনার গায়ে প্রায় সেঁটে গেছে। আউটসাইডার তো বটে। তার সামনে সব কথা আলোচনা করা ঠিক নয়। শেষ-মেষ গণা বলেই ফেলল, জামাইবাবু, সিঙ্গিগিন্নির স্ট্রোক হবে। চলুন, আমরা আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

ষষ্ঠীচরণ কানে নিল না। মোনার দিকে হাসি ভরা মুখে তাকিয়ে বলল, এ লাইনে আমার খুব ইণ্টারেস মানসকুমারবাবু। দারুণ ইণ্টারেস।

দীপু বলল, ইন্টারেস তো ঢুকে পড়ুন না জামাইবাবু। মোনার সঙ্গ ধরুন।

ষষ্ঠীচরণ বলল, তা ওনার কি সে অনুগ্রহ হবে? জানেন মানসকুমারবাবু, আমাদের গাঁয়ে যাত্রা-টাত্রা খুব হয়। ছোটখাট রোলে যে না নেমেছি, এমন নয়। এই তো গত পূজোয় 'আলতা দিও না ধুয়ে'তে হেমন্তর পার্ট করলুম। সাত নম্বর পার্ট। তবে আপনার দিব্যি, আসরে চোখের জলের…

বান ডেকেছিল তো? বলে গণা ওর হাত ধরল।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ষষ্ঠীচরণ গণাকে ঠেলে মোনার সামনে দাঁড়াল। বলল, 'টেনিং' দিলে সবই সম্ভব। কি বলেন মানসকুমারবাবু?

মোনা বলল, তা ঠিক। তবে কি জানেন? ফোটোজেনিক ফেস হওয়া চাই।

সেটা কী বলুন তো?

মানে চেহারা দেখতে সুন্দর হলেই তো হয় না। ক্যামেরা ফেস করতে জানা চাই। তাছাড়া চেহারা ছবিতে সুন্দর হওয়া চাই। অনেক সুন্দর সুন্দর চেহারা দেখতে পাই আমরা। কিন্তু ছবি তুলুন, দেখবেন কি বিচ্ছিরি লাগছে। আবার এমনিতে দেখতে তত ভালো নয়, অথচ ছবিতে ওয়াণ্ডারফুল।

ষষ্ঠীচরণ বলল, মানসকুমারবাবু, এই যে আমাকে দেখছেন। দেখে বলুন তো 'ফটোজিং' নাকি?

মোনা শুধরে দিয়ে বলল, ফটোজেনিক।

ওই হল! বলে ফ্যাঁচ করে সেই হাসি হাসল ষষ্ঠীচরণ।

দীপু বলল, কি মুশকিল, সিঙ্গিমশাই একমাত্র মেয়ের জন্যে সাড়ে বারোশো পাত্র ক্যানসেল করে আপনাকে সিলেক্ট করেছিলেন কি সাধে? নেমে পড়ুন দাদা। মোনা, লেজে বেঁধে নিয়ে যা।

ষষ্ঠীচরণ বলল, এক্ষুনি রাজী।

বিদ্যুৎ বলল, তার চেয়ে সিঙ্গিমশায়ের আয়রণ চেস্ট ঝেড়ে

একখানা ছবি প্রডিউস করে ফেলুন না জামাইবাবু। নিজেই নায়ক হয়ে যান। মোনা তো ভিলেন আছেই।

গণা বাদে সবাই সায় দিল হইচই করে। ষষ্ঠীচরণ সিরিয়াস হয়ে বলল, একখানা বই নামাতে কত খচ্চা হয়, মানসকুমারবাবু?

মোনা বলল, সে অনেক। আজকাল সবকিছুর 'কস্ট' বেড়ে গেছে ভীষণ।

তাও কত?

ব্ল্যাক এ্যাণ্ড হোয়াইটে লাখ চার-পাঁচ ধরুন। আর কালারে লাখ তিরিশ।

ষষ্ঠীচরণ দমে গিয়ে বলল, উরেব্বাস! একেবারে বজ্রঘাতী ব্যাপার।

মোনা বলল, আহা! একা প্রোডিউসার তো দিচ্ছেন না অত টাকা। ধরুন, অনেক ক্ষেত্রে মাত্র হাজার বিশেক সম্বল করেও নামতে দেখেছি। তারপর ডিস্ট্রিবিউটার আছেন। তিনি সব দেবেন।

ষষ্ঠীচরণ নিশ্বাস ফেলে বাঁচল।—তাই বলুন। তা মানসকুমারবাবু, এই ব্যাপারটা একটুখানি বুঝিয়ে বলুন না। আমার একটু-আধটু আইডিয়া না আছে, এমন নয়। তবে সেটা ঝালিয়ে নেওয়া ভালো।

দীপু বিদ্যুতের কাঁধে হাত রেখে বলল, আয়। মোনা, যাচ্ছি। কাল দেখা হবে। অংশু বলল, আসি রে!

ওরা তিনজনে চলে গেলে গণা বলল, রাত সাড়ে নটা বাজে। খেয়াল আছে?

মোনা অন্যমনস্ক হয়ে গেছে হঠাৎ। বলল, তাতে কী। আয়, জামাইবাবুর সঙ্গে গল্প করতে করতে এগোই।

গণা রাগ চেপে বলল, আমার এক জায়গায় যাওয়া দরকার ছিল। দেরী হয়ে গেল। চলি, কাল সকালে গিয়ে তোকে ডাকব।

মোনা বলল, আয় না গণা।

এই সময় সিঙ্গিমশায়ের বাড়ি থেকে লোক এলো।—জামাইবাবু, বাড়ি আসুন। গিন্নীমা খুঁজছেন।

ষষ্ঠীচরণ দাঁত খিঁচিয়ে বলল, খুঁজছেন মানেটা কী? আমি কি গরু না ছাগল যে খোঁজাখুঁজি হচ্ছে?

লোকটা ভড়কে গিয়ে বলল, ওই একটা কথার কথা। গিন্নীমা বললেন. দিনকাল খারাপ। এত রাত্তির অব্দি ঘোরাঘুরি করা ঠিক না, বাড়ি আসতে বল।

একটু দেরী হবে বল গে।

লোকটা একটু দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেল। গণা বলল, যাই রে। তুই গল্প কর। গণা চলে গেলে ষষ্ঠীচরণ বলল, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা হয় না। চলুন না, বরং আমার শ্বশুরবাড়িতে গিয়েই বসবেন। নিরিবিলি ঘর। খুব ভালো লাগবে।

মোনা বলল, থাক।

সিঙ্গিবাড়ির লোকেরা মোনাকে পাত্তা দেয় না। সিঙ্গিমশাই তো মোনাকে দেখলেই মুখ ঘোরান। ছেলেবেলায় সিঙ্গিমশাইকে বন্ধুরা মিলে খুব জ্বালিয়ে মেরেছে। বড় হাড়কেপ্পন মানুষ। চাঁদা চাইতে গেলে পুলিশ দেখাতেন। মুশকিল হচ্ছে, ওঁর ভাইপো পুলিশের ইন্সপেক্টর।

এক সময় সিঙ্গিমশাইয়ের মহাজনী কারবারে রবরবা ছিল। বেআইনী হয়ে যাবার পরও সেটা গোপনে চলেছে। এখনও শহরের বড় বড় মানুষ ঠেকে গেলে ওঁর কাছে দৌড়ে যান। নিরাশ হন না। বন্ধকী কারবারটাও চলেছে এই সঙ্গে। শোনা যায় এখানকার রাজবাড়িরও অনেক দামী জিনিস ওঁর আলমারিতে বন্ধকের দায়ে আটকে আছে।

ওঁর মেয়ের নাম হেমবরণী। চেহারা বিশেষ সুবিধের নয়। গণারা বলত হিড়িম্বারানী। হেমবরণীকে হিড়িম্বারানী করে তুললে বাড়িসুদ্ধু লোকের রাগ হওয়ার কথা। নেতাজী ক্লাবে পাড়ার সবাই চাঁদা

দিয়েছে, ফাংশানে পুজোয় সবাই দেয়—সিঙ্গিবাড়ি বাদে। সিঙ্গিবাড়ির জামাইকে তাই এত খাতির। আগে থেকে জমি তৈরি রাখা হচ্ছে। ষষ্ঠীচরণ ঘরজামাই। অতএব একদিন ও-ই সংসারের একচ্ছত্র মালিক হবে।

তবে সে ছেলে হিসেবে ভারি ভালো। মিশুক, অমায়িক। একটু বোকা-সোকা এই যা। গাঁয়ের ছেলে তো। মাঝে মাঝে বেফাঁস গেঁয়ো কথা বেরিয়ে পড়ে। সেই নিয়ে ওকে উত্যক্ত করলেও রাগে না। সেদিন লুকিয়ে ফিস্টি দিয়েছে ক্লাবে। সবে মাসকয়েক হল বিয়ে হয়েছে। তবে ক্লাবে আড্ডা দিতে আসছে সপ্তাটাক আগে থেকে। এ নিয়ে সিঙ্গিবাড়ির প্রতিক্রিয়া কী, এখনও জানা যায়নি।

অবশ্য গণা বলেছিল, সিঙ্গিবা দেখছে, জামাইকে তো পাড়ায় থাকতে হবে। আপোস না করলে চলবে কেন? ষষ্ঠীবাবু হলেন সিঙ্গিদের যাকে বলে এনভয়। মোনা ডিটেল্‌স জানে না। কিন্তু সিঙ্গিবাড়ির ঘরজামাই এবং ফিল্মে 'ইণ্টারেস' শুনে তার মাথায় কী একটা কুটকুট করছে। ষষ্ঠীচরণের বয়স এদের চেয়ে বেশী বলে মনে হচ্ছে। কমপক্ষে আটাশ তো বটেই। রোগা হাড়গিলে চেহারা। গালে মাস নেই। সম্ভবত গরীব ফ্যামিলির ছেলে। মোনা বুঝতে পারছিল না এ গেঁয়ো মাল কেমন করে ঝুনো সিঙ্গিমশাইয়ের চোখে ধরল।

মোনা তার কিং-সাইজ সিগারেট অফার করে বলল, আসুন দাদা।

ষষ্ঠীচরণ খুশি হয়ে বলল, এ কী সিগারেট মানসকুমারবাবু?

মোনা নাম বলে মন্তব্য করল, এ ফিল্ম ওয়ার্লডের স্পেশাল ব্র্যাণ্ড।

নিশ্চয় অনেক টাকা দাম?

দশ।

উরেব্বাস!

মোনা হাসল।—ভড়কাবার কিছু নেই। ও লাইনটাই এমনি।

যত ব্যয়, তত আয়। লাখ লাখ টাকার ট্রানজাকশান মশাই। তাছাড়া ধরুন, পরিবেশটাই আলাদা। অপূর্ব সুন্দর সুন্দর সব মেয়ে ঘোরাঘুরি করছে। কলকাতার হাই সোসাইটির মেয়ে। আপনি মফস্বল থেকে গেছেন, ধরুন। আপনাকে নিজের প্রেস্টিজ রাখতে খরচ করতেই হবে। বাই বা বাই, আপনি ড্রিঙ্ক করেন না?

ষষ্ঠীচরণ কাঁচুমাচু হাসল।—কালীপুজোর রাতে একটু আধটু।

দিশী তো? মোনা গম্ভীর হয়ে বলল, খাবেন না কখনো। পয়জন।

বিলিতী কখনও খাইনি। ষষ্ঠীচরণ ফিসফিস করে বলল, শুনেছি, খেতে সরবতের মতো।

মোনা ফিল্মের হাসি হেসে বলল, নেভার মাইণ্ড। আপনাকে খাওয়াব।

ষষ্ঠীচরণ কিছু বলতে যাচ্ছিল, চমকে উঠল। লাঠি ঠুকঠুক করে স্বয়ং সিন্নিমশাই আসছেন। নিশ্চয় জামাইয়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছেন। জামাইকে একদণ্ড না দেখলে থাকতে পারেন না। মোনা বলল, চলি।...

॥ তিন ॥

পরদিন সূর্য উঠতে না উঠতে ষষ্ঠীচরণ হাজির। তাকে নীচের ঘরে বসিয়ে রেখে বেচা ওপরে মোনাকে ডাকতে গিয়েছিল। এ কাজ বেচার নয়। দরজা বন্ধ করে ছোটবাবু ঘুমোচ্ছে। জানালার পর্দা সরিয়ে বেচা চাপা গলায় কয়েকবার ডাকাডাকি করেছিল। তারপর নীচে নেমে ষষ্ঠীচরণকে বলেছিল, জামাইবাবু, ঘণ্টাখানেক পরে আসুন। আমাদের ছোটবাবু কুম্ভকর্ণ।

করুণাময়ীর কান সজাগ সব সময়। বসার ঘরের পর্দা তুলে উঁকি মেরে বললেন, কে রে বেচা?

আজ্ঞে, সিঙ্গিমশাইয়ের জামাই। ছোটবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

ষষ্ঠীচরণ আরাম করে হেলান দিয়ে বসে বলল, আমি বরং ওয়েট করছি।

বেচা বিব্রত বোধ করছিল। এ বাড়ির নিয়মকানুন সৃষ্টিছাড়া। বাইরের লোক যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ তাকে চোখে চোখে রাখার একটা অলিখিত নির্দেশ আছে। কাল সন্ধ্যায় বেমক্কা গণা ঢুকে পড়েছিল একেবারে উঠোন অব্দি, তাই নিয়ে পাঁচমুখে পঞ্চকথা সয়েছে। খালি বড় বউঠাকরান বাদে। বেচার কাছে উনি সাক্ষাৎ দেবীপ্রতিমা। অর্থাৎ অভয়দায়িনী। সে বিপদে পড়লে শেষ মুহূর্তে মাথা বাঁচাতে এগিয়ে আসেন।

সিঙ্গিদের সঙ্গে দত্তদের অবশ্য অসদ্ভাব কিছু নেই। তবে যাতায়াতও নেই পরস্পর। বেচা দরজার দিকে তাকালে করুণাময়ী বললেন, বেচা! জামাইবাবুর গরম লাগছে না? ফ্যানটা খুলে দে। জানলাগুলো খুলিসনি কেন? খুলে দিয়ে ভেতরে আয়।

পর্দার আড়াল থেকে, মুখটুকু জাগিয়ে কথা বলছিলেন করুণাময়ী। ষষ্ঠীচরণ দাঁত বের করল সেই মুখের দিকে তাকিয়ে। বেচা ফ্যানের সুইচ টিপে জানালা খুলতে ব্যস্ত হল।

অধীরবাবু ততক্ষণে স্নান শেষ করেছেন। উঠোনের যে কোণায় উদীয়মান সূর্যকে দেখা যায়, সেখানে দাঁড়িয়ে গামছাপরা অবস্থায় সূর্যপ্রণাম সেরে নিয়েছেন। টুপ টুপ করে জল ঝরছে মেঝেয়। বললেন, কে গো?

করুণাময়ী চাপা গলায় বললেন, সিঙ্গির জামাই। মোনার কাছে এসেছে।

আলাপ আছে নাকি? অধীরবাবু সন্দিগ্ধ ভাবে বললেন, মোনা তো তাকে কখনও দেখেইনি।

করুণাময়ী রাগ দেখিয়ে বললেন, আলাপ হয়েছে। তোমার সবতাতেই ইয়ে। অ মেজবউ, চা পাঠিয়ে দাও।

অধীরবাবু ঘরে ঢুকে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে থাকলেন। ব্যাপারটা ভালো ঠেকছে না। সিঙ্গির জামাই সম্পর্কে ওই তল্লাটের লোকের কাছে নানা রকম কথা শুনেছেন। বংশ ভালো, এক সময় পয়সা কড়িও নাকি প্রচুর ছিল। কিন্তু সিঙ্গির বেয়াই মদ আর মেয়েমানুষে সব উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়েছেন। শেষ জীবনে প্রায় ভিক্ষে করে বেড়াতেন। এমন ফ্যামিলির ছেলেকে সিঙ্গি জামাই করে এনেছেন। ভাবতে অবাক লাগে। অবশ্য সিঙ্গি বড় একগুঁয়ে মানুষ। একবার যাতে মত দেবে, প্রাণ গেলেও না করবে না। তবে তার চেয়ে বড় কথা, সিঙ্গির মেয়েটি সত্যিই হিড়িম্বা ওই যে ছেলে ছোকরারা বলে!

অধীরবাবু আপন মনে খিলখিল করে হেসে ফেললেন। বাইরে থেকে করুণাময়ী জিজ্ঞেস করল, কি গো? সাত সকালে তোমার আবার কি রঙ লাগল?

অধীরবাবু আবার গম্ভীর হয়ে গেলেন। দেরী হয়ে যাচ্ছে। সাঁইথে থেকে এক ট্রাক খোল-ভূষি আসার কথা ছিল। শেষ রাত্রে এসে থাকলে এখন আড়তের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। গোডাউনের চাবি বিশ্বাস করে রামপদকে দিয়ে এলে ভালো হত। শ্রীবিষ্ণু ট্রান্স-পোর্টের ট্রাক। তার মালিক জগদীশ নন্দীর এক কথা, আনলোডিংয়ে গড়িমসি দেখলে রাস্তায় মাল নামিয়ে চলে আসবে ট্রাক। লেট করানো চলবে না। অধীরবাবুর এই জগতটাই এমন কাঠখোট্টা রসিকতা করে—হাসার সময় আছে?

বড় গেলাসে অনেকটা চা আগে, তারপর খানছয়েক ফুলকো লুচি আর আলুভাজা, এই ব্রেকফাস্ট দ্রুত সেরে বেরিয়ে এলেন। সাইকেল বের করে বেচা গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু হঠাৎ ঘুরে বসার

ঘর হয়েই যাবেন ভাবলেন। সিঙ্গির জামাই ছোকরাকে একবার চাক্ষুষ করার তীব্র কৌতূহল।

ষষ্ঠীচরণ টের পেয়েছিল। উঠে এসেই পায়ে হাত ঠেকাল। অধীরবাবু খুশি হয়ে বললেন, থাক থাক। আশীর্বাদ করি বাবা। তুমি সিঙ্গিদার জামাই?

ষষ্ঠীচরণ দাঁত বের করে বলল, আজ্ঞে।

বসো বসো। মোনা এক্ষুনি উঠবে। ও বেচা, জামাইকে চা-ফা দিয়েছিস?

ষষ্ঠীচরণ এঁটো কাপ দেখিয়ে বলল, আজ্ঞে বহুক্ষণ। আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না।

ছেলেটিকে তো ভালোই মনে হচ্ছে দেখে শুনে। না, সিঙ্গি বড় পাকা লোক। সে কি আর বোকামি করবে? আসলে পয়সা কড়ি এমন জিনিস, সঙ্গ ছাড়লে মানুষের খামোকা বদনামের একশেষ হয়। দেখ দিকি, এমন সুন্দর ভালোমানুষ ছেলেটিকে ঠক জোচ্চোর চোরের বদনাম দিতেও লোকের অভাব নেই সংসারে।

অধীরবাবুর মোটে তিন ছেলে। মেয়ে নেই। অর্থাৎ বেঁচে নেই। রঞ্জু আর অমলের মাঝখানে একটি মেয়ে গর্ভে ধরেছিলেন করুণাময়ী। ভালোয় ভালোয় প্রসব করতে পারেননি। জন্মের পর মাত্র ঘণ্টা চারেক বেঁচে ছিল।

গেটের কাছে যেতে যেতে অধীরবাবুর মনে সিঙ্গিবাড়ির জামাইকে দেখে সেই পুরনো শোক জেগে উঠল। ভারি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, আয় বেচা। কিন্তু মনটা কতক্ষণের জন্যে কেমন হয়ে গেল আজ। আহা, হতভাগিনী বাঁচলে তিনিও একটি উল্লেখযোগ্য জামাই পেতেন।

(অধীরবাবু হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে গেছেন বাপের জীবনে ছেলে আদৌ সুখের বস্তু নয়। ছেলে মানেই বেমক্কা প্রতিদ্বন্দ্বী। তার বদলে জামাই বস্তুটি খানিকটা নির্ভরযোগ্য। ঔরসজাত নয় বলেই যেন এক গভীর আনুগত্য জামাইবাবাজীদের মধ্যে প্রকট থাকে।)

রঞ্জু আর অমল ইতিমধ্যেই নাগালের বাইরে দাঁড়িয়ে গেছে। রিঙের দু'ধারে দুজন, একধারে অধীরবাবু। ভবিষ্যৎ ঝাপসা ঠেকছে। তার ওপর ওই মোনা। তাকে তো কবে খরচের খাতায় লিখে ফেলেছেন। এমন পরিস্থিতিতে না বাঁচা মেয়ের একটি দুঃসম্ভব বরের কথা ভেবে অধীরবাবুর অন্যমনস্ক পা সাইকেলের প্যাডেল হাঁতড়াতে গিয়ে ধুতির খানিকটা জড়িয়ে ফেলল চেনে। চেনকভার নেই। বেচা চেঁচিয়ে উঠল—কাপড ! কাপড় !

অধীরবাবু ভেংচি কেটে বললেন, ,থাম্।·· তারপর বেরিয়ে গেলেন।

তার খানিক পরে গণা এলো। বসার ঘর খোলা দেখে বারান্দায় উঠেছিল সে। তারপর মুখ গলিয়ে সিঙ্গিমশায়ের জামাইকে দেখে বিরক্ত হল।

ভেতরে ঢুকে ফ্যানের নীচে দাঁড়িয়ে সে শার্টের কলার পিঠে ঠেলে নামিয়ে বুকে হাওয়া নিতে লাগল। শেষরাত থেকে আজ গাছের পাতা স্থির। দিনকাল বদলে যাচ্ছে পৃথিবীতে। চৈত্র মাসে দিনরাত তুলকালাম হাওয়া বয়। শহরের দক্ষিণ-পূর্ব ঘুরে নদী গেছে। মোনাদের বাড়ির পিছনে বাগান, পোড়ো আগাছা ভরা জমির পর নদীর পাড়ে নীচু বাঁধ। বারোমাস হাওয়া খেলে এদিকে। ওপারে ধূ ধূ মাঠ।

ষষ্ঠীচরণ তাকে দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। পকেট থেকে মোটা-মুটি দামী সিগারেট (আসার পথে কিনেছে) বের করে বলল, আসুন গণাবাবু।

গণা বলল, কী ব্যাপার ?

মানসকুমারবাবুর কাছে। আবার কী ?

মোনা ওঠেনি ?

না। দেরী আছে বলল। ততক্ষণ ওয়েট করি।

তাহলে ফিল্মে নামবেনই ঠিক করেছেন ?

ষষ্ঠীচরণ ক্যাঁচ করে হাসল।—কী যে বলেন! ওই একটু-আধটু ইন্টারেস আর কি।

গণার মুখে হাসি নেই, পেটে আছে। মুখখানা সিরিয়াস করে চাপা গলায় বলল, একবার শ্বশুরমশাইকে যদি পটাতে পারেন দাদা, বাস! আরে দু'লাখ কেন সিঙ্গিমশাইয়ের কাছে দশবিশ লাখ হাতের ময়লা। কোন্ যক্ষপুরীতে ঢুকেছেন টের পাননি তো!

ষষ্ঠীচরণ অপ্রস্তুত হেসে বলল, কী যে বলেন গণাবাবু! শ্বশুর-মশাইয়ের টাকা আছে তো আমার কী। ছাড়ুন ও কথা। সিগারেট নিন।

বেচা এসে দেখে গেছে। ভেতরে খবরও দিয়েছে। কিন্তু এবার আর চা নয়। করুণাময়ী বলেছেন, লক্ষ্য রাখিস। বড্ড হাত-নেপ্‌টা ছেলেটা।

এদিকে খালি কাপের দিকে চোখ পড়েছে গণার। বলল, চা খেয়েছেন দেখছি!

আজ্ঞে। আপনিও পাবেন। বলে ষষ্ঠীচরণ শ্বাশুরিক ঘড়িটি দেখে নিল।

গণা বলল, পাব। মোনা না নামলে নয়।

দুজনে চুপচাপ সিগারেট খেতে থাকল। বেচা মাঝে মাঝে কখনও বাইরে থেকে কখনও ভিতর থেকে এ ঘরে ঢুকছে। দু-একটা কথাও বলছে। আবার চলে যাচ্ছে। ঘুরনচরকির মতো।

আরও কিছুক্ষণ পরে বাইরে রাস্তার দিকে জলির গলা শোনা গেল। বেচার সঙ্গে কথা বলছে। গণা উঠে দরজার পর্দা সরিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়াল।

জলির সঙ্গে মহী দারোগার মেয়ে। গণার দিকে তাকিয়েই মুখ ঘোরাল। জলি বলল, এই যে গণাদা! মোনাদা কোথায়?

গণা গম্ভীর মুখে বলল, এখনও ওঠেনি। তারপর সে বারান্দা থেকে নেমে তেমনি গম্ভীর হয়ে চলে গেল।

জলি বলল, এসো শ্রাবন্তী।

শ্রাবন্তী একটু ভুরু তুলে বাড়িটা দেখছিল। গণাকে লক্ষ্য করল না। বলল, থাক বরং। পরে এক সময় হবে।

জলি তার হাত ধরে টানল।—আহা, এসোই না বাবা। তোমার বাবা পুলিশ। তোমাকে কেউ হজম করতে পারবে না।

জলি হাসছিল। শ্রাবন্তী একটু গাঁইগুঁই করে বলল, ওঠেননি যে।

আমি ওঠাব। তুমি এসো তো!...

বেচা ওদিকে ফের দোতলায় গিয়ে আকাশ ভাঙছে। করুণাময়ী গলা তুলে বললেন, এ্যাই বেচা! ওকে জ্বালাতন করছিস কেন? সময়মত ঠিক উঠবে।

নীচের ঘরে ষষ্ঠীচরণ তখন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। জলি তার দিকে তাকাতে তাকাতে শ্রাবন্তীকে নিয়ে ভিতরে ঢুকল। সামনে করুণাময়ী হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন।

জলি বলল, জেঠিমা, এই দেখুন কাকে নিয়ে এলুম।

কে রে জলি? মেয়েটিকে কখনও দেখিনি মনে হচ্ছে।

ও-সি মহীবাবুর মেয়ে জেঠিমা।

অ। বলে করুণাময়ী তাকিয়ে রইলেন তেমনি চোখে।

উঠোনে অমিতা দাঁড়িয়ে গেছে। শান্তা চা খাচ্ছিল কিচেনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে সেও থমকে গেছে। ঝি বিমলা কর্তার ভিজে কাপড় মেলে দিতে দিতে ঘুরে পাথর হয়ে আছে। এই সেই মেয়ে! শহরের মস্তানদের লোলা দিয়ে টস্‌টস্ করে জল ঝরিয়ে ছেড়েছে।

ওপর থেকে নামতে নামতে সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে অমল বলল, কী রে জলি? ওপাশে নীচের ঘর থেকে বেরিয়ে রঞ্জুও বলল, কে রে জলি?

জলি বলল, মহীবাবুর মেয়ে। মোনাদার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছে।

এ যুগেও মোটামুটি রক্ষণশীলতা এ বাড়িতে আছে। অতএব ব্যাপারটা নতুন। এবং কিঞ্চিৎ বিরক্তিকরও! তাতে মহী দারোগার মেয়ে। কিছুদিন আগে ওকে নিয়ে অমন কেলেঙ্কারী হয়ে গেল। জনা তিনেক মস্তান টাইপ ছেলে বেধড়ক মারধোর খেল। এর সামগ্রিক প্রতিক্রিয়াটা এই ছোট্ট শহরেব অধিবাসীদের মধ্যে পুলিশবিরোধী হওয়াই স্বাভাবিক ছিল।

করুণাময়ী বেচার উদ্দেশে হাঁক পাড়লেন, ঠিক যে ভঙ্গীতে মানুষ গাছের ডালের কাক তাড়ায়। কিন্তু শাস্তা মিষ্টি হেসে বলল, যাও না জলি! ওপরে নিয়ে যাও। আমি আসছি।

জলি টের পাচ্ছিল, হঠাৎ জলে ঢিল পডাব ব্যাপার ঘটেছে। ঘটবে তার ভাবা উচিত ছিল আগেই। কিন্তু তার মানসিকতায় বরাবর কী এক ত্রুবলতা আছে। অফিসার-টফিসারের মেয়েদের বড্ড বেশি খাতির করে সে। তাতে পুলিশ অফিসারের মেয়ে। শ্রাবন্তীর সঙ্গে সে নিজে যেচে পডে আলাপ করেছিল। আজ তাকে মোনার কাছে টেনে এনেছেও জোর করেই।

শ্রাবন্তী ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে বাড়ির ভেতরটা দেখছিল। এ শহরে তারা অনেক বছর আছে। কিন্তু তত মেলমেশা কেন যেন হয়ে ওঠে না কারও সঙ্গে। তার আগ্রহ সত্ত্বেও ওকে যেন সবাই কেমন এড়িয়ে চলে। এমন কী তার স্কুল-কলেজের বন্ধুরাও। শুধু জলি বাদে।

সে এটা বোঝে। আসলে তার বাবার দক্ষ পুলিশ অফিসার হওয়াটা অদ্ভুত ভাবে বদনামে দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু সে কী করতে পারে এতে? তার বাবা হয়তো ঘুষ খান, বদমাস ঠেঙিয়ে শায়েস্তা করেন, একটু দেমাকী ও বদমেজাজী মানুষও বটে। তার জন্য তাঁর মেয়েকে লোকে কেন এমন চোখে দেখবে? শ্রাবন্তীর মনে এই তুঃখটা পোষা। সেই তুঃখের জন্যেই সে শেষ অব্দি রাগ করে কারও সঙ্গে মেশা ছেড়ে দিয়েছে। একা একা ঘোরে। ওভাবে ঘুরতে গিয়ে

কিছুদিন আগে বিপদেও পড়েছিল। কয়েকটা দিন যেতে না যেতে আবার সেই। বেপরোয়ামি ফিরে এসেছে। মজার কথা, এই বেপরোয়ামি প্রকাশের তলায় তার একটা বোধ জড়িয়ে আছে যে সে পুলিশ অফিসারের মেয়ে। ইচ্ছে করলেই যুবকদের নাকের জলে চোখের জলে করে ছাড়তে পারে। তাই শহরের যুবকদের সে গণ্যই করে না। ডাঁটে হেঁটে যায় চোখের ওপর দিয়ে। ইচ্ছে করেই একটু ভাঁজ খেলিয়ে রাস্তায় পা ফেলে। কোথাও একদঙ্গল যুবক দেখলে তার আইসক্রিম খাওয়ার তাগিদ জাগে এবং দেখিয়ে দেখিয়ে চোষে।

জলি তাকে টানলে সে সিঁড়ি বেয়ে অনিচ্ছার ভঙ্গীতে উঠে গেল।

ততক্ষণে বেচার শ্রম সফল। বেচার মতে, স্বয়ং মহী দারোগার মেয়ে এসেছে ছোটবাবুর কাছে। এ কি সহজ কথা?

মোনা নাইট ড্রেস পরে শোয়। উঠে ড্রেসিং গাউন চড়িয়ে যথার্থ স্টারের ভঙ্গীতে তৈরি। দরজা খুলল, তখন ঠোঁটে আটকানো সিগারেট। এলোমেলো চুল। চোখের তলায় কাল্‌চে ছোপ থাকলেও মুখের ভাবটা ফোলা ফোলা। গলায় গাঢ় স্বর।—হাই! বলে সে অনবদ্য ভঙ্গীতে একপাশে সরে দাঁড়াল। তারপর শ্রাবস্তীর দিকে মুখ ঈষৎ ঝুঁকিয়ে মিষ্টি হেসে বলল, মর্ণিং!

জলি বলল, তুমি সত্যি বড্ড ইয়ে। বেচারী কতক্ষণ ওয়েট করে চলে যাচ্ছিল।

মোনা কাঁধ ঝাঁকি দিয়ে বলল, আই'ম হেল্পলেস জলি। প্লীজ সিট ডাউন।

খাটের সামনা সামনি জানালার নীচে ছোট্ট সোফাসেট। জলি ও শ্রাবস্তী বসল।

এক সময় মোনা মেয়েদের চোখে চোখ রাখতে পারত না। কথা বলতে বলতে চোখের দৃষ্টি এপাশে ওপাশে ঘোরাত। কলকাতায় গিয়ে সেই চক্ষুরোগ সেরে গেছে। বেশি রকমই সেরেছে। এবং

এখনকার চাউনিটা পাল্টা আরেক রোগ বলেও মনে হতে পারে। তবে সে লোচ্চামিটা রপ্ত করতে পারেনি। মনের ভিতর একটা অপরাধ সচেতনতা থাকে, যা হয়তো রক্ষণশীল পারিবারিক সূত্রে পাওয়া।

শ্রাবন্তী এমন চোখের পাল্লায় কখনও পড়েনি। এ শহরের লোকেরা সম্ভবত মহী দারোগার ভয়েই রামকৃষ্ণদেবের শিক্ষা মেনে চলতে অভ্যস্ত, অর্থাৎ শ্রাবন্তীর পায়ের দিকে দৃষ্টি রাখে। কিন্তু এ চোখ অন্য চোখ। উজ্জ্বল, সুন্দর, অন্তর্ভেদী—অন্তত শ্রাবন্তীর মনে হল তা। ক্রমশ সে একটু মিইয়ে গেল।

জলি বলল, কী, মুখে কোন কথা নেই। আমাদের হিরোর সঙ্গে আলাপ কর।

মোনা জোরালো শুকনো হেসে বলল, ভিলেন বল জলি। 'দিনান্তে' আমি ভিলেন। রোল ছোট। কিন্তু ওটুকুতেই সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটিয়ে ছেড়েছি। জাস্ট এ টুইস্ট, মানে মোচড়।

শ্রাবন্তী একটু হাসল।—ফিল্ম ম্যাগাজিনে স্টোরিটা পড়েছিলুম মনে হচ্ছে।

পড়েছিলেন তো? মোনা সামনাসামনি খাট থেকে একটু ঝুঁকে এলো। তাহলেই বুঝতে পারছেন, আমি এমন ব্যাপার ঘটালুম যে নায়কের জীবন উল্টো দিকে ঘুরে গেল। ধরুন যাচ্ছিল কলকাতা, চলে গেল দার্জিলিং। তাই না?

জলি বলল, 'দিনান্ত' এখানে কবে আসবে মোনাদা?

মোনা কাঁধ ঝাঁকি দিয়ে বলল, দ্যাট্‌স নট মাই কনসার্ন। আমি কি ডিস্ট্রিবিউটার না এক্সিবিটার? আগে কলকাতায় রিলিজ হোক, তবে সে কথা।

শ্রাবন্তী বলল, ম্যাগাজিনেই আপনার ছবি দেখেছিলুম। হঠাৎ এখানে আপনাকে দেখে চমকে উঠেছিলুম। আপনার সঙ্গে অংশুবাবুকে দেখে তখন ভাবলুম, যাই জলিদির কাছে।...

জলি কথা কেড়ে বলল, এই শ্রাবন্তী, তুমি আমাকে দিদি বলবে

না কিন্তু। তুমি আমার মোটে এক বছরের জুনিয়র, মাইণ্ড দ্যাট! ওটা কোন ব্যাপারই নয়।

শ্রাবন্তী এতক্ষণে স্বাভাবিক হল। চোখ নাচিয়ে বলল, আগে-ভাগে লুপহোল বন্ধ করে দিচ্ছ কিন্তু। বলুন তো মোনাবাবু…

মোনা হাত তুলে বলল, আপনি ওই কুৎসিত মফস্বলী নাম ধরে ডাকবেন না প্লীজ। স্টুডিওপাড়ায় সবাই আমায় মানসকুমার বলে ডাকে। নিরিমিষ মানসকুমার। বাবু-টাবু বাদ দেবেন। তারপর, সরি, আসছি—বলে সে বারান্দায় গেল।

জলি চাপা গলায় শ্রাবন্তীর কানের কাছে মুখ রেখে বলল মোনাদা ভীষণ স্ট্রেইট ফরোয়ার্ড। সাবধান!

শ্রাবন্তী একটু রাঙা হয়ে বলল, অসভ্যতা!

জলি তেমনি ফিসফিস করে বলল, তোমার যা চেহারা, দেখবে মোনাদা প্রোপোজ করবে। মানে, তোমার কপাল খুলে যেতেও পারে।

শ্রাবন্তী ওকে গুঁতিয়ে দিয়ে বলল, বড্ড অসভ্যতা করছ কিন্তু! চলে যাব বলছি।

ভ্যাট্! তুমি কি ভাবছ বল তো? জলি নিরীহ মুখ করে বলল, আমি বলছি তোমার সিনেমায় নামার কথা। তোমার মতো চেহারা থাকলে আমি কি প্রাইভেট টিউশনি করতুম ভাবছ? মোনাদা থাকতে?

জলি খিলখিল করে হেসে উঠল। শ্রাবন্তীও। এই সময় শান্তা ঢুকল। জলি উঠে তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলল, শ্রাবন্তী, আমার এই বউদিটি কিন্তু ওয়াণ্ডারফুল গাইয়ে, জানো? চোখ বন্ধ করে শুনলে তোমার মনে হবে লতা গাইছে। হুবহু। কী সুন্দর তুলেছেন গানগুলো।

শান্তা ওকে ছাড়িয়ে হাসি মুখে সামনা সামনি খাটে বসল। শ্রাবন্তীর দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি ও-সির মেয়ে?

শ্রাবন্তী দুঃখু-দুঃখু মুখ করে বলল, আমার এই জ্বালা। আমার সঙ্গে বাবার পরিচয় জড়িয়ে সবাই কথা বলে। আমার যেন আলাদা সত্ত্বাই নেই।

কয়েকজন মেয়ে এক জায়গায় থাকলে যা হয়, কথায় কথায় খিলখিলিয়ে হাসি, আর এ-কথা সে-কথা। আসর জমে গেল। মোনা গেছে নীচে। চা-ফা বলতেই গেছে নিজের তদ্বিরে। অমিতা বলেছে, সে মাথাব্যথা তোমার নয়। বাড়িতে গেস্ট এলে কি করতে হয় আমরা জানি।

জাঁদরেল দারোগাবাবুর মেয়ে এ বাড়ি এসেছে। তার খাতির ঠিকমত হবে। করুণাময়ী ফ্রিজ খুলে সন্দেশ আর ফল বের করছেন। মোনা খুশি হয়ে উঠে আসছিল। সামনে বেচাকে দেখে বলল, বেচাদা, শোন এদিকে।

বেচা বলল, সিঙ্গিমশায়েব জামাই ও ঘরে কখন থেকে বসে রয়েছেন।

মোনা জিভ কেটে বলল, সরি! দেখছি। তুমি এক কাজ কর তো। শিগগির ভোঁদাবাবুর ওখান থেকে ফার্স্ট ক্লাস একটা আইসক্রিম নিয়ে এসো।

তারপর সে বাইরে বসার ঘরে উঁকি দিল। ষষ্ঠীচরণ সোফায় চিতিয়ে বসে আছে। চোখ দুটো বন্ধ। নিশ্চয় দিবাস্বপ্নে মশগুল। মোনা বলল, এই যে ষষ্ঠীবাবু।

ষষ্ঠীচরণ তড়াক করে উঠে এ্যাটেনশান দাঁড়িয়ে করজোড়ে বলল, নমস্কার নমস্কার। তারপর সে অবাক দৃষ্টিতে মোনার ড্রেসিং গাউনের দিকে তাকিয়ে রইল।

মোনা বলল, নিশ্চয় অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি। আসুন আসুন। ওপরে আমার ঘরে গিয়ে কথা বলা যাবে। আরও অনেকে আছে। আসুন।

সিঁড়ির মুখে এসে ষষ্ঠীচরণ মোনার ড্রেসিং গাউন ছুঁয়ে পরখ

করার ভঙ্গীতে বলল, বইতে দেখেছি এ ড্রেস। আপনার দৌলতে স্বচক্ষে দেখলুম।

মোনা হাসি চেপে বলল, স্বচক্ষে! বইতে কি পরচক্ষে দেখেছিলেন ষষ্ঠীবাবু?

ষষ্ঠীচরণ ক্যাঁচ করে হেসে বলল, এই না হলে বইতে কেউ চান্স পায়! কেমন ঝটপট কথার পৃষ্ঠে কথাখানা বসিয়ে দিলেন! আমার মাথায় কি আসত? আপনাদের এ গুণ আছে বলেই না লোকে পয়সা খরচ করে বই দেখতে ছোটে!

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে ষষ্ঠীচরণ আরও কিঞ্চিৎ তাবিফ করল। নীচে কিচেন থেকে নজর চলে না, কিন্তু গলার আওয়াজে সিঙ্গিব জামাইয়েব ওপরে যাওয়া টের পেলেন করুণাময়ী। বড় বউকে বললেন, সিঙ্গির জামাইকে নিয়ে গেল ওপবে। শুনেছি ছেলেটাব নাকি স্বভাব-টভাব ভালো না।

অমিতা বলল, ঠাকুরপোর নাম হয়েছে। লোকজন তো আসবেই। বরং নীচে ওই কোণেব ঘরে আড্ডার ব্যবস্থা হোক না মা। ছেলেমেয়েদের পড়াশুনোর বারোটা বেজে যাবে। ওই দেখুন বুলুরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে!

করুণাময়ী দেখে গলা তুলে নাতি-নাতনিদের ধমক দিলেন।

ষষ্ঠীচরণকে নিয়ে মোনা ঘরে ঢুকলে শান্তা ঈষৎ আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়াল। মোনা বলল, মেজবউদি, আমাদের সিঙ্গিমশায়ের জামাই। বসুন দাদা, বসুন।

শান্তা জলি ও শ্রাবন্তীর দিকে তাকিয়ে বলল, তোমরা গল্প কর। এবার আমি সংসারের ঘানি টানি গে! শ্রাবন্তী দেখা করে যেও কিন্তু।

শান্তা চলে গেল। ষষ্ঠীচরণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল শ্রাবন্তীর দিকে।

মোনা বলল, জলি, আমাদের জামাইবাবুর সঙ্গে আলাপ নেই তোমার? ষষ্ঠীবাবু, এ হচ্ছে অংশুর বোন জলি। আর ইনি শ্রাবন্তী রায়।

ওরা দুজনে ষষ্ঠীচরণকে নমস্কার করল। ষষ্ঠীচরণ হঠাৎ সেই খ্যাঁচ শব্দে হেসে বলল, ভয়ে বলি কি নির্ভয়ে বলি?

মোনা বলল, এ ঘরে আমি যতক্ষণ আছি, আপনি নির্ভয়।

ষষ্ঠীচরণ শ্রাবন্তীর দিকে লাজুক মিটিমিটি চেয়ে বলল, বইতে ইনি যদি নায়িকার পার্ট করেন, ধন্য ধন্য পড়ে যাবে!

জলি ও শ্রাবন্তী হেসে উঠল। মোনা বলল, দারুণ বলেছেন। আপনাকে কাল রাতে ফোটোজেনিক ফেসের কথা বলছিলাম। আমার মনে হচ্ছে, এর ফেস ফোটোজেনিক। ভয়েসটাও দারুণ উৎরাবে। টেপরেকর্ডার ক্যামেরা কিছু আনিনি এবার। তাড়াতাড়ি চলে এলুম। নৈলে এক্ষুণি টেস্ট হয়ে যেত।

জলি বলল, এই মোনাদা! আমার দারুণ হিংসে হচ্ছে কিন্তু! শ্রাবন্তী, তাহলে তোমার কপাল খুলে গেল!

শ্রাবন্তী আরও রাঙা হয়ে গেল। ষষ্ঠীচরণ জলিকে খুশি করতে চেয়ে বলল, আপনাকেও মানাবে। আপনিও ফেলনা নন। কি বলেন মানসকুমারবাবু?

মোনা সায় দিয়ে সিগারেট ধরাল। ষষ্ঠীচরণকে সিগারেট দিতে গেলে সে বলল, আহা, আমারটা আগে অফার করা উচিত ছিল। ওটা নিভিয়ে ফেলুন।

মোনা ব্র্যাণ্ড দেখে বাঁকা হেসে বলল, চলবে না দাদা। রাখুন।

এই সময় বেচা আইসক্রিম হাতে ঘরে ঢুকল। মোনা দ্রুত তার হাত থেকে আইসক্রিমটা নিয়ে শ্রাবন্তীর সামনে সিনেমাটিক কায়দায় তুলে ধরল। শ্রাবন্তী ফ্যাল ফ্যাল করে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকার পর দু'হাতে মুখ ঢেকে নিঃশব্দ হাসিতে ভেঙে পড়ল।

জলি খিলখিল করে হেসে বলল, দারুণ মোনাদা...দারুণ!

মোনা বলল, আমি স্বচক্ষে দেখেছি উনি আইসক্রিম খেতে ভালোবাসেন।

কিন্তু শ্রাবন্তী কিছুতেই নেবে না। মোনা অনেক সাধাসাধি করে হাতে নেওয়াতে পারল না। জলিও নিল না। তখন মোনা নিরাশ হয়ে বলল, ষষ্ঠীবাবু, তাহলে আপনিই নিন বরং।

ষষ্ঠীচরণ ফ্যাঁচ করে হেসে হাত বাড়াল। গোলাপী রঙের ভাপ ওঠা আইসক্রিমটা চুষতে থাকল। সে এ ঘটনার তাৎপর্য বোঝে না। জলি খুব অল্পই বোঝে। বোঝে মোনা আর শ্রাবন্তী। শ্রাবন্তী অবশ্য মোনার চেয়ে অনেক বেশি বোঝে। কারণ ব্যাপারটা তারই।

তারপর আর আড়ষ্টতা ঘোচে না শ্রাবন্তীর। কেমন মিইয়ে গেছে যেন। ফের শান্তা এলো কিছুক্ষণ পরে। সঙ্গে বেচা ট্রে ভর্তি সন্দেশ, পেঁপে-আপেলের কুচি। তারপর চা। ষষ্ঠীচরণ আপ্লুত হয়ে গেছে বোঝা যাচ্ছিল। 'বই'য়ের লোকের সঙ্গে এমন আড্ডা আর আহারের কথা সে স্বপ্নেও কল্পনা করেনি। ঝোঁকের মাথায় বলেও ফেলল, খুব আনন্দে সময়টা কাটল মানসকুমারবাবু। থাকি যক্ষপুরীতে। কেমন একটা গুমোট হাবভাব সিঙ্গিবাড়িতে সারাক্ষণ লেগে আছে। বুঝলেন? দম আটকে যায় মশাই। মানস-কুমারবাবুর সঙ্গে আলাপ হওয়া বড় ভাগ্যের কথা। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম।

মোনা দ্রুত বাথরুম সেরে এসেছে এক ফাঁকে। তারপর চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ষষ্ঠীচরণের উদ্দেশে বলল, আমার মাথায় অনেক দিন থেকে একটা আইডিয়া খেলছে।

ষষ্ঠীচরণ বলল, কী—কী? জলি শ্রাবন্তীও আগ্রহে তাকাল।

শান্তা মুখ টিপে টিপে হেসে বলল, জানি। তোমার সেই গল্পটাতো?

মোনা বলল, এক্স্যাক্টলি। মেজবউদিকে বলেছিলুম। জানেন

শ্রাবন্তী? লিখি-টিখিনি। ও বিদ্যে-বুদ্ধি বিশেষ নেই। তবু কী ভাবে এসে গিয়েছিল ওটা। ষষ্ঠীচরণ অধৈর্য হয়ে বলল, বলুন না খুলে মশাই!

মোনা বলল, গল্পটা হল, ধরুন ওই যেমন একটা নদী। নদীর ওপারে থাকে একটি মেয়ে, এপারে একটি ছেলে। কেমন?

ষষ্ঠীচরণ ফ্যাঁচ করে হেসে বলল, দারুণ। তারপর? তারপর?

দুজনের মধ্যে প্রেম-ট্রেম হল। তারপর বিয়ের কথাও পাকা। হঠাৎ নদীতে ভীষণ ফ্লাড। মেয়েটি ভেসে গেল। ছেলেটিও ভেসে গেল। দুজনে দু'জায়গায় আশ্রয় নিল। তারপর মেয়েটিকে উদ্ধার করে পাঠানো হল আশ্রমে। সেখানে থাকতে থাকতে সে সন্ন্যাসিনী হয়ে গেল। সরি, বলতে ভুলেছি। মেয়েটির তখন স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে। আগের কথা কিছু মনে নেই। এদিকে ছেলেটি তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে এখানে সেখানে। তারপর একদিন সেই আশ্রমের পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ দেখল, এক ইয়ং সন্ন্যাসিনী পুজোর ফুল তুলছে। ছেলেটি চেঁচিয়ে উঠল তাকে দেখে। কিন্তু মেয়েটির তো কিছু মনে নেই। বোবা হয়ে গেছে। এদিকে আশ্রমের সন্ন্যাসী ভীষণ ইয়ে, মানে…

ষষ্ঠীচরণ লাফ দিয়ে উঠে বলল, মার কৈলাস। হাউস ফুল। ওই রোলটা আমার। 'কাপালিক' বইতে আমি সাধুর পার্ট করেছিলুম।

শান্তা ঠোঁটের কোণায় হেসে এবং চোখে ঝিলিক তুলে বলল, সিঙ্গিমশাইয়ের তো অনেক টাকা। তাঁর জামাই থাকতে মোনা-ঠাকুরপোর ভাবনা কী? প্রোডিউসার প্রোডিউসার করে নাকে কেঁদে বেড়াতে হবে না।

মোনার সমস্যা শান্তাই যা বোঝে, এবং এটা দীর্ঘ নিভৃত আলোচনার ফলাফল। মোনা ষষ্ঠীচরণের মুখটা দেখে নিয়ে বলল, নিজে ছবি করার চেষ্টায় আছি। আমার চেনা-জানা ডিস্ট্রিবিউটারও আছেন। কিন্তু মিনিমাম মালকড়িটা তো আগে চাই।

ষষ্ঠীচরণ গম্ভীর হয়ে বলল, তাও কত ?

আপাতত হাজার বিশেক তো বটেই।

ষষ্ঠীচরণ চুপ করে চোখ পিট্‌পিট্‌ করতে থাকল। জলি ও শান্তা হেসে উঠল।

জলি বলল, ব্যস! এই তো পেয়ে গেলে। জামাইবাবু থাকতে ভাবনা ?

শান্তা বলল, আর নায়িকাও পেয়ে যাচ্ছ ?

জলি শ্রাবন্তীর পাঁজরে খোঁচা মেরে বলল, শুনতে পাচ্ছ তো ?

শ্রাবন্তী সলজ্জ হাসল।—যাঃ! আমি কি পারি নাকি ?

মোনা বলল, সে আমি দেখব। শুধু গার্জেনকে রাজী করাবেন। তাহলেই হল।

শ্রাবন্তী মুখ নামিয়ে বলল, লোকে যা-ই রটাক, বাবা মোটেও কড়া নন।

এতক্ষণে ষষ্ঠীচরণ ধ্যান ভেঙে ফ্যাঁচ করে হাসল। তারপর বলল, হবে।

॥ চার ॥

কলকাতা থেকে মোনা এসে দু-তিনটে দিনের বেশি থাকে না। থাকার দরকার হয় না। ওই সময়ের মধ্যে তার ক্যাশ-কড়িটা মোটামুটি যোগাড় হয়ে যায়। কিন্তু এবার এসে ভাবগতিক দেখে মুসড়ে পড়েছিল। সেই সময় সিঙ্গিমশাইয়ের জামাই ষষ্ঠীচরণ সামনে আশার আলো জ্বেলেছে। ভেতর ভেতর মোনা উত্তেজনায় গরম হয়ে গেছে। বোকা গেঁয়ো লোকটাকে প্রচণ্ড রকমের পটাতে পেরেছে। বিশ হাজার না হোক, তার সিকিটা পেলেও মোনার স্বর্গসুখ। পার্টি কী ভাবে সামলাতে হয়, এতদিনে সে অল্পস্বল্প

শিখেছে। বাঁকুড়ার এক আলু ব্যবসায়ীর ছেলেকে পটানো সে স্বচক্ষে দেখেছিল। ছবি তোলার আয়োজনেই বেচারার ক্যাশ খতম হয়েছিল। তারপর ক'দিন আনাচে কানাচে ঘুরে কোথায় যে চলে গেল কে জানে। ডাইরেক্টার অবনীবাবু অন্য ছবি নিয়ে ব্যস্ত।

এটাই নিয়ম। তবে হাজার বিশেক যোগাতে পারলে অবনীবাবু, মোনার অবনীদার অনেক সুবিধে হয়। মোনারও হয়। তার রোলটা এ ছবিতে মোটামুটি বড়। শেষ দিকটায় ভিলেনের ভোল বদল হবে হিরোতে। অতএব মোনা স্বপ্ন দেখছে। এ ছবির বেলায় তঞ্চকতা হবে না সে বোঝে। অবনীদা জান লড়িয়ে দিয়েছেন। নিজেই প্রডিউসার কিনা। কেষ্টনগরের লোক উনি। সেই সুবাদে ওখানকার কোন মহাজন পাকড়ে চড়া সুদে হাজার তিরিশেক ধার করেছেন। আর হাজার বিশেক হলেই নাকি ডিস্ট্রিবিউটার জোটে। সমব্যথী মোনা রামের সেতুবন্ধনের কাঠবেড়ালির ভূমিকা বরাবর নিতে চেয়েছে। 'দিনান্তে' মহরতের দিনের পুরো খরচা সে দিয়েছিল। ছবিটা অনেক ঝ ক্কতে শেষ হয়েছে। অবশ্য রিলিজের খবরই নেই।

মোনা সব সময় হিসেব করে যাচ্ছে মনে মনে। ষষ্ঠীচরণের টাকাটা পেলে কী ঘটতে পারে, কল্পনা করছে। ওকে একটা ছোট্ট রোলে ঢোকানো কঠিন কিছু না। অবনীদা রাজী হয়ে যাবেন। শুধু রাজী কী, হাতে স্বর্গ পাবেন। তারপর? ষষ্ঠীচরণের আখের ষষ্ঠীচরণ নিজেই সামলাবে। স্টুডিও পাড়ায় একবার পা দিলেই হল। অবনীদা তাকে ট্যাক্‌ল্ করবেন।

কিন্তু ষষ্ঠীচরণ যখনই আসে, মোনার গল্পটার কথা তোলে। মহী দারোগার মেয়ের কথাও বলে। কান ঝালাপালা করে ছেড়ে দিচ্ছে। দৈবাৎ শ্রাবন্তীর সঙ্গে দেখা হলে, সে রাস্তাঘাটে হোক কিংবা মোনার ঘরে হোক, বিদঘুটে সেই ফ্যাঁচ্ শব্দ করে হেসে অস্থির। তারপর আবোল তাবোল কথা। শ্রাবন্তী বিরক্ত হয়ে চলে যায়। কিন্তু শ্রাবন্তীকে নয়, মোনার দরকার ষষ্ঠীচরণকে। সুন্দরী মেয়ে সে ঢের

দেখেছে। আড্ডা দিয়েছে। এখন তার ও সব চোখ' সওয়া। উঠ্‌তি কোন ট্যালেন্টেড নায়িকার সঙ্গে প্রেম করার সুযোগ পেলে, করবে—এই পর্যন্ত। তার আসল লক্ষ্য : নাম-করা অভিনেতা হওয়া।

দিন তিনেক কেটে গেল। ষষ্ঠীচরণ তখনও সুবিধে করতে পারছে না। আজ কাল করে কাটাচ্ছে। বলছে শাশুড়ির কাছে চেয়েছি। দেবেন বলেছেন। কিন্তু মোনা জানে, ডাঁহা মিথ্যা। ষষ্ঠীচরণকে শ্বশুরের আলমারি ভাঙতেই হবে। হয়তো সেই সুযোগটাই পাচ্ছে না বেচারা।

এদিকে বাড়িতে এবার কথা উঠেছে। সিঙ্গির জামাই আসছে আসুক। মহী দারোগার মেয়ে আসছে কেন? এসে মেয়েদের সঙ্গে আড্ডা দিক। তা নয়, হুট করে মোনার ঘরে চলে যাওয়া। কেলেঙ্কারী না হয়ে যাবে না। মহী দারোগা কবে না তলব পাঠায়।

করুণাময়ী তার আভাস দিয়েছেন মোনাকে। মোনা গ্রাহ্য করে না।

রঞ্জন ভালোমানুষ। বউকে বলেছে, মোনাকে একটু সাবধান করে দিতে। অমিতা বলেছে, আমার দায় পড়েছে। টুংয়ের মা-ই তো মহী দারোগার মেয়েকে ডেকে আনে।

টুংয়ের মা! শান্তার প্রশ্রয় নিশ্চয় আছে। শ্রাবন্তী এলে সে হাতের কাজ ফেলে দৌড়ে গিয়ে আহ্লাদেপনার চূড়ান্ত করে। অমলও ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে। বলেছে, হচ্ছেটা কী? মোনা যাবে কবে বলেছে?

শান্তা রেগে জবাব দিয়েছে, আমি কি তোমার ভাইয়ের মনের কথা জানি? নিজেই জিজ্ঞেস করোগে না।

ষষ্ঠীচরণের টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি বুদ্ধিমতী শান্তা গোপন রেখেছে বাড়িতে। সে মোনা ঠাকুরপোর অনুরাগিনী এবং গুণমুগ্ধা। গোপনে তাকে কতবার টাকাকড়ি দিয়েছে শান্তা। আহা, ফিল্মে নামার কপাল করে তো কেউ আসে না। ঠাকুরপোর বরাত যখন

খুলেছে, তখন তাকে অন্য চোখে দেখা উচিত বই কি। শাস্তার মতে, প্রতিভাবানরা একটু আধটু খামখেয়ালী হয়। মোনাঠাকুরপো প্রতিভাবান বলেই তো পত্রিকায় ছবি ছাপা হয়েছে।

ষষ্ঠীচরণ তার টাকা দেওয়ার কথাটা গোপন রাখতে বলেছিল। মোনা পইপই করে নিষেধ করেছিল জলিকে। শ্রাবন্তীর সামনেই। জলি ওটা গোপন রেখেছে, তার প্রমাণ অংশুরা ও কথা তোলেনি মোনার কাছে।

কিন্তু অংশু, গণা সবারই প্রশ্ন: সিঙ্গির জামাইকে এত খাতির করছে কেন মোনা? বিদ্যুৎ চোখ টিপে বলেছে, ডালমে কুছ কালা হ্যায়।

গণা বলেছে, ঠিক হ্যায় বাবা! সিঙ্গিকে ঝাড়ুক না ওর জামাই। যখের টাকা। বিস্তর লোকের রক্ত। এভাবেই তো উশুল হয়। তোরা চুপচাপ দেখে যা।

মুশকিল হয়েছে, সিঙ্গির জামাইকে তাসের আসরে বসিয়ে একটা শূন্যস্থান পূরণ করা যায়, ওই অব্দি। ওর সঙ্গে মেশা যায় না। কথাবার্তা কেমন গেঁয়োবুদ্ধুর মতো। রাস্তাঘাটে মেয়ে দেখলেই ফিল্মের কথা তোলে। আর মহী দারোগার মেয়ের জন্যে তো একেবারে অস্থির। সাধ্য থাকলে পুলিশ কোয়ার্টারে গিয়ে ঢোকে। ওকে নানান ভয় দেখিয়ে তবে চুপ করাতে হয়।

চার দিনের দিন সকালবেলা অধীরবাবু ভিজে গামছা পরা অবস্থায় চুলে চিরুনী টানছেন, বেচা খবর দিল, সিঙ্গিমশাই এসেছেন।

অধীরবাবু একটু অবাক হয়ে বললেন, কোন্ সিঙ্গি?

করুণাময়ী বাইরের বারান্দা থেকে ভেংচি কেটে বললেন, ক'টা সিঙ্গি আছে এদেশে? নীতু সিঙ্গি ছাড়া?

অধীরবাবু খাপ্পা হয়ে বললেন, তাতে আমার কী? এই সাত-সকালে? আজ নির্ঘাৎ কপালে কিছু আছে।

করুণাময়ী বললেন, বয়স হয়েছে। একটু ভদ্রতা-টদ্রতা এবার শেখ। চিরটাকাল তো দোকানদারী করে কাটালে। অ বেচা, সিঙ্গিমশাইকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছিস নাকি?

বেচা বলল, হ্যাঁ গিন্নিমা। বললুম, ভেতরে বসবেন আসুন। এলেন না। মনে হল রাগে খালি কাঁপছেন।

করুণাময়ী একটু হতাশ হয়ে বললেন, সিঙ্গিমশাইয়ের সঙ্গে তো আমাদের শত্রুতা নেই। কে জানে বাবা! হ্যাঁ গো, কোন কালে ওঁর সঙ্গে দেনাপাওনা কিছু ছিল না তো? হয়তো পুরোনো খাতা থেকে বেরিয়ে পড়েছে।

অধীরবাবু ধুতি ও ফতুয়া পরে বেরিয়ে এলেন ব্যস্তভাবে। কথা কেড়ে বললেন, একবার নাইন্টিন ফর্টিফোর-টোর হবে, হঠাৎ অভাবে পড়ে সাময়িক কিছু টাকা চেয়ে পাঠিয়েছিলুম। ইণ্টারেস্ট দিতুম। দেয়নি। মহাকেপ্পণ! ভেবেছিল দত্তরা পাঁকে পড়েছে। আর উঠতেই পারবে না।

করুণাময়ী আর কথা বললেন না। অধীরবাবু বসার ঘরের দরজা খুলে বললেন, বেচা! জানলা খুলে দে। ফ্যানটা চালা। তারপর বাইরের বারান্দায় গিয়ে দেখেন, নন্দদুলাল সিংহ রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে যথারীতি থেঁটের মতো তোবড়ামুখো একটা মোটা ছড়ি। শরীর আরও প্যাঁকাটি হয়ে গেছে যেন। গায়ে হাফ-পাঞ্জাবি, পরনে প্রায় হাঁটু অব্দি ধুতি, পায়ে থ্যাবড়া পাম্পসু। অধীরবাবু ডাকলেন, সিঙ্গিদা নাকি! এসো, এসো, কি সৌভাগ্য!

নাডু সিঙ্গি মুখ তুলে কেমন চোখে তাকিয়ে থপ থপ করে উঠে এলেন বারান্দায়। তারপর প্রায় মুখের ওপর মুখ এনে বললেন, তোমার কনিষ্ঠ পুত্রটিকে একটু সাবধান করে দিও। সেই কথাটাই বলতে এলুম।

অধীরবাবু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে বললেন, আমি তো দাদা কিছুই বুঝতে পারছিনে!

পারবে। মনে করিয়ে দিও, সিঙ্গির ভাইপো পুলিশ ইন্সপেক্টার।

হ্যাঁ।

বলে থপথপ করে সিঁড়ি বেয়ে নামতে যাচ্ছেন, অধীরবাবু পিছন থেকে একটা হাত ধরে ফেললেন, আহা! অত ক্ষেপছ কেন সিঙ্গিদা? ব্যাপারটা কি বুঝিয়ে না বললে কী বুঝব ' দেখ দিকি কাণ্ড!

নান্তু সিঙ্গি ঘুরে একদমে বললেন, আমার জামাইকে বদবুদ্ধি দিয়েছে তোমার ছেলে। বুঝলে? রাত্তির থেকে খায়-টায়নি। হেমার সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করেছে। হেমা কেঁদে-কেটে অস্থির। অনেক কথা খরচ করে জানলুম, জামাইকে সিনেমায় নামাবে বলেছে তোমার ছেলে। তাতে নাকি অনেক টাকাকড়ি লাগবে। হারামজাদা জামাই বায়না ধরেছে, টাকা চায়।

অধীরবাবু গলার ভেতর বললেন, মোনা তোমার জামাইকে··· যাঃ! অসম্ভব!

নান্তু সিঙ্গি আরও খাপ্পা হয়ে বললে, তোমার ছেলে ডাকাত! আমি লক্ষ্য করেছি, প্রতিবার আসে আর পাড়ার ছেলেপুলেদের মাথা খায়। শেষ কথা বলে গেলুম, ওকে সাবধান করে দিও।

তারপর চলে গেলেন। পায়ের বাত বেড়ে গেছে মনে হল চলা দেখে। অধীরবাবু থ হয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে ঘরে ঢুকলেন। ঢুকেই সামনে পেলেন করুণাময়ীকে।—শুনলে সিঙ্গি শালা কি বলে গেল? শাসিয়ে গেল —শুনলে? ভাইপোর ভয় দেখিয়ে গেল আমাকে।

করুণাময়ী বাঁকা মুখে বললেন, তোমার মুখ ছিল না? বেশ তো হাঁ করে কথাগুলো গিললে দেখলুম। বলতে পারলে না তোমার জামাইই মন্নুকে দু'বেলা এসে পটাচ্ছে? ওই হনুমানমুখো গেঁয়ো ভূতের মাথায় সিনেমার পোকা ঢুকেছে বলতে পারলে না। হুঁঃ, দায় পড়েছে মন্নুর। মন্নুর সে ক্ষমতা আছে বলেই না লুফে নিয়েছে ওরা।

গোলমাল শুনে অমল কিচেনের বারান্দা থেকে এঁটো হাতে উঠে এলো। বলল, কি হয়েছে মা?

করুণাময়ী টুংকে দোলাতে দোলাতে ভেতরে গেলেন।—হাতি ঘোড়া গেল তল, ভেড়া বলে কত জল! সিঙ্গির জামাই সিনেমায় [illegible] জেদ ধরেছে। এখন সিঙ্গি এসে মনুকে শাসাচ্ছে।

অমল বলল, মোনার কপালে সত্যি দুর্ভোগ আছে মা!

শান্তা ঝাঁঝালো স্বরে বলে উঠল, থামো! আমি জানি সব। না জেনে ফড়ফড় কোরো না তো!

অমল চটে গেল।—তোমারই আস্কারা পেয়ে মোনা এ সব করতে সাহস পাচ্ছে। সিঙ্গির জামাই এলে মনে হয় যেন তোমারই জামাই এসে গেছে। তার জন্য চা সন্দেশ এটা ওটা! কোন মানে হয়? এ বাড়ির একটা প্রেস্টিজ ছিল!

রঞ্জু খেতে খেতে বলল, আহা হলটা কি?

তখনও মোনা ওঠেনি বিছানা ছেড়ে। কিন্তু তার ঘুম ভেঙে গেছে। নীচের সব কথা কানে যাচ্ছে। জলে ভেসে আছে যেন। চুপচাপ সিগারেট টানছে শুয়ে। মাথার ভেতরটা খালি লাগছে।

শান্তা গলা চেপে সবাইকে শুনিয়ে বলল, ঠাকুরপোর একটুও দোষ নেই। সে কখনও সিঙ্গির জামাইকে টাকার কথা বলেনি। উল্টে জামাইবাবু নিজেই টাকা দিতে চাইল। জলি সাক্ষী, শ্রাবন্তী সাক্ষী। সিঙ্গি খামোকা যা তা বললেই হল। ওখানে বাবা না থাকলে আমিই মুখের ওপর জুতো মারার মতো···

বেশি হয়ে যাচ্ছে দেখে রঞ্জু ধমক দিল ভাজবউকে, আঃ! হচ্ছেটা কি!

অধীরবাবু গুম হয়ে বেরিয়ে গেলেন সাইকেল নিয়ে। সিটে উঠতে বেশ কয়েক পা লাফ দিতে দিতে এগোতে হয়, আজ অনেকটা দূর অব্দি লাফ দিতে দিতে গিয়ে তবে সিটে উঠতে পারলেন।

কাজের মানুষ পিতাপুত্র তিনজনেই। কথা না বাড়িয়ে বেরিয়ে

গেল'। রাগে শান্তার মুখ জ্বলছে যেন। পায় তো সিঙ্গিমশাইকে চিবিয়ে খায়।

অমিতা যথারীতি গম্ভীর। দুধ নাড়ছে উনুনে। করুণাময়ী টুংকে নিয়ে অনেক কষ্ট করে রেলিঙ ধরে ধরে ওপরে উঠে গেলেন। মোনার দরজার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে হাঁফ সামলে নিলেন। তারপর পর্দা তুলে দেখলেন দরজা আটকানো। ছেলেকে ডাকতে গিয়ে আর ডাকলেন না। থাক্, ওকে উত্যক্ত করে লাভ কী। শান্তার কথা বিশ্বাস করতে অভ্যস্ত করুণাময়ী।

পাশের ঘরে বুলুরা পড়তে বসেছে। তাদের কাছে গেলেন। এ বেলা মাস্টার আসেন না। আসেন সেই সন্ধ্যেবেলা। তাই ছেলেমেয়েগুলো যথেচ্ছ স্বাধীনতা উপভোগ করছে। করুণাময়ী বললেন, এ কী রে! তোরা খেলছিস?

মোনা বাথরুম সেরে সেজেগুজে নীচে এলো আরও আধঘণ্টা পরে। কিচেনের বারান্দায় যথারীতি চেয়ারে বসল চায়ের জন্যে। শান্তার ঠোঁটের কোণায় হাসি। মোনা বলল, কী মেজবউদি? হাসছ যে?

কুকারে মোনার চা-ওমলেট করে দিচ্ছে শান্তা। বলল, তোমার দুর্দশা দেখে।

কিসের দুর্দশা! বেশ তো আছি।

শান্তা গলা চেপে বলল, সিঙ্গিমশাই এসে শাসিয়ে গেলেন একটু আগে।

মোনা কাঁধ ঝাঁকি দিয়ে বলল, সো হোয়াট? আমি সব শুনেছি।

শান্তা রুটিতে মাখন লাগাতে লাগাতে বলল, কী শুনেছ! তুমি তখন স্বপ্ন দেখছিলে।

মোনা চটুল হেসে বলল, আজ্ঞে না স্যার। তোমাদের সব কথা শুনেছি এবং বুঝেছি, আমি এবার একটি সেরা গাড়োলের খপ্পরে পড়েছি।

শান্তা হাসতে থাকল।—এবার মহী দারোগার জন্যে ওয়েট কর ঠাকুরপো। দেখ, সে এসে আবার শাসায় নাকি—আমার মেয়েকে পটিয়ে…বলেই অমিতার দিকে এবং শাশুড়ির উদ্দেশ্যে তাকিয়ে জিভ কাটল শান্তা।

মোনা তাচ্ছিল্য করে বলল, ভ্যাট্ ভ্যাট্! কত লক্ষ লক্ষ শ্রাবন্তী ফ্যা ফ্যা করে সেধে বেড়াচ্ছে! জাস্ট্ গুলতানি করছি ওকে নিয়ে, বোঝ না?

শান্তা প্লেট এগিয়ে দিয়ে দুষ্টু হেসে ফিসফিস করে বলল, গুলতানি করতে গিয়েই তো সবাই প্রেমে পড়ে যায়! সাবধান, লক্ষণ ভালো নয়।

মোনা চোখ নাচিয়ে বলল, আমার—না শ্রাবন্তীর?

দুজনেরই।

মোনা লাফিয়ে উঠে বলল, দোহাই মেজবউদি! আর যাই বল, এমন কথা বোলো না যে তোমাদের ওই মফস্বলী মা—থুড়ি, মফস্বলী জন্তু দেখে মোনার মনে প্রেম-ট্রেম আসবে। রিয়েলি বউদি, তুমি কোথায় আছ? আমি যেখানে ঘুরি, কল্পনা করতে পারবে না, সে দঙ্গল! চোখ ঝলসে যাবে।

শান্তা বলল, হুঁউ। দেখা যাক্।

একটু পরে মোনা বেরুল। রাস্তায় গিয়ে একবার ভাবল, জলিদের বাড়ি যাবে, আবার ভাবল, থাক। গণার খোঁজ নেওয়া যাক্। গণারা এ সময় থাকে জগার নীলা রেস্তোরাঁয়।

কিছুদূর এগিয়েছে, পাশে আওয়াজ উঠল, রোখো! রোখো!

মোনা ঘুরে দেখে, সাইকেল রিক্শো থেকে ষষ্ঠীচরণ নামছে। এই তিন দিনে তার আকার প্রকার কিছুটা বদলেছে। গায়ে চকরা বকরা বেঢপ শার্ট, বেল্ট আঁটা পাতলুন, চুলে শ্যাম্পু করছে প্রতি দিন। ফলে চুলের অবস্থা শোচনীয়। মোনা দেখেছে, বিদেশী জামা পাতলুন রাস্তার ধারে ঢেলে বিক্রি হচ্ছে এখানেও। এ নাকি

চোরাচালানী মাল, বিপদগ্রস্ত কোন দেশকে কোন ধনী দেশ দান করেছিল, অথচ চোরাপথে সব ভারতে এসে শস্তায় বিক্রি হচ্ছে। সিঙ্গিমশাইয়ের জামাই ধুতি থেকে আচমকা সেই পোশাকে ভোল পাল্টে ফেলেছে।

ষষ্ঠীচরণ রিক্শো ভাড়া মিটিয়ে করুণ মুখে তাকাতে তাকাতে মোনার সঙ্গ ধরল। মোনা নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে বলল, কী খবর ষষ্ঠীবাবু? কিন্তু মোনার মনে এখন হতাশা ও দুর্যোগের ঝড় বইছে। রাগ কি কম হচ্ছে বুদ্ধুটার ওপর? ওভাবে টাকার যোগাড় করতে যাবে, সে ভাবতেই পারেনি।

ষষ্ঠীচরণ বলল, এক কাণ্ড হয়েছে মানসকুমারবাবু।

মোনা সংক্ষেপে বলল, শুনেছি।

শুনেছেন? ষষ্ঠীচরণ তার একটা হাত নিল। হাঁটতে হাঁটতে চাপা স্বরে বলল, সোজা আঙুলে ঘি উঠল না। বুঝলেন? আপনি ভাববেন না। আজ রাতের মধ্যেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

মোনা একটু মেজাজ দেখিয়ে বলল, মশাই! আপনি সত্যি মাইরি বড্ড ইয়ে! আপনি আমাকে জড়াতে গেলেন কেন বলুন তো? আপনার শ্বশুর এসে বাড়িসুদ্ধ তোলপাড় করে শাসিয়ে গেলেন। এর ফলটা কী হবে, বুঝতে পারছেন?

ষষ্ঠীচরণ ফ্যালফ্যাল করে তাকাল।

পুলিশে খবর দেবে, যদি আপনি কিছু চুরি-চামারি করে বসেন!

ষষ্ঠীচরণ জোরে মাথা দোলাল।—। না, না, না। তেমন কিছু করবে না। মুখে যা-ই বলুক, আমাকে ছাড়া চলবে ওদের? সে উপায় নেই মানসকুমারবাবু।

মোনা বলল, আপনি জামাই, আপনার কিছু হবে না। কিন্তু আমাকে বিপদে ফেলবেন না? আপনার শ্বশুরের ভাইপো—আই মিন, আপনার খুড়তুতো শালা পুলিশ ইন্সপেক্টার।

ষষ্ঠীচরণ এতক্ষণে তার হাসিটি হাসল। অর্থাৎ ফ্যাঁচ্ শব্দ করে

বলল, সে তো ঘুষের রাজা মশাই! আমার শ্বশুরবাড়ির সবাই বলাবলি করে ও অনাদি জ্যাঠার কাছে পর্যন্ত ঘুষ খেয়েছে। মানে আমার শ্বশুরমশায়ের কাছেও। ভাবুন।

ও সব বাজে কথা ছাড়ুন। শুনুন···

বাধা দিয়ে ষষ্ঠীচরণ বলল, আমার কথাটা আগে শুনে নিন না! আমার শ্বশুরমশাইয়ের মহাজনী কারবার ছিল তো। সেটা নাকি বেআইনী। শ্বশুরমশাই বিপদে পড়েছিলেন। তখন অনাদিদা অনেক টাকাকড়ি নিয়ে ম্যানেজ করে দেয়। বুঝলেন তো ব্যাপারটা?

মোনা শিরিষগাছের তলায় সিগারেট ধরাতে দাঁড়াল। ষষ্ঠীচরণকেও দিল একটা। তারপর বলল, ও আপনি আর ম্যানেজ করতে পারবেন না। ছাড়ুন।

ষষ্ঠীচরণ ফিসফিস করে বলল, পারি কি না পারি দেখুন। আজই রাতে টাকা পেয়ে যাবেন। সেই কথাটা জানাতেই আপনাদের বাড়ি গিয়েছিলুম। গিয়ে শুনি বেরিয়েছেন।

মোনা ভাবনায় পড়ে গেল। ষষ্ঠীচরণ তার মুখের দিকে কুতকুতে চোখে তাকাচ্ছে আর ঘন ঘন টান দিচ্ছে সিগারেটে। একটু পরে মোনা বলল, টাকা আমাকে দিতে হবে না। আপনি নিজের কাছেই রাখুন। আপনাকে একটা ঠিকানা দেব কলকাতার। সেখানে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করবেন।

ষষ্ঠীচরণ অধীর হয়ে বলল, আমি যে কলকাতার পথ-ঘাট ভালো চিনি না। বার তিনেক গেছি মোটে। সেও লোকের সঙ্গে। আমি আপনার সঙ্গে যাব।

আচ্ছা, ভেবে দেখি।

ষষ্ঠীচরণের মুখটা নিভছে আর জ্বলছে। চোখের পাতা পিটপিট করছে। সিগারেটে শেষটান দিয়ে ছুড়তে গিয়ে হঠাৎ ফ্যাঁচ করে হেসে বলল, আপনার হিরোইন আসছে! ওই দেখুন।

মোনা ঘুরে দেখল, খেলার মাঠের ধার ঘেঁষে নাচুনে ভঙ্গীতে

হেঁটে আসছে শ্রাবন্তী। পুলিশ কোয়ার্টারের উল্টো দিক এটা। ষষ্ঠীচরণ ওর একটা হাত খপ্ করে ধরে বলল, চলুন না। কথা বলে নিই।

মোনা ভুরু কুঁচকে বলল, কিসের কথা ?

আহা, ওকে তো জানাতে হবে, কবে কলকাতা যাচ্ছি আমরা।

কেন ?

ষষ্ঠীচরণ ভড়কে গিয়ে বলল, বইতে ওকে পার্ট দেবেন বললেন না ?

মোনা হো হো করে হেসে বলল, সর্বনাশ! আপনি নিজেও ডুববেন, আমাকেও ডোবাবেন। মহী দারোগার মেয়েকে কলকাতা নিয়ে যাবেন ভাবছেন নাকি ?

ষষ্ঠীচরণ মনমরা হয়ে গেল একটু। বলল, বা রে! আপনিই তো সেদিন বললেন, স্টুডিওতে নিয়ে গিয়ে 'ক্রিনটেস' করাবেন, 'ভয়িসটেস' করাবেন···

মোনা তার কাঁধে হাত রেখে বলল, চেপে যান। ওর চেয়ে অনেক সুন্দরী মেয়ে আপনি দেখতে পাবেন কলকাতায়। মহী দারোগা সাংঘাতিক লোক!

ষষ্ঠীচরণ তাচ্ছিল্য দেখিয়ে বলল, আমার খুড়তুতো শালাও পুলিশ ইন্সপেক্টার। আমি ডোণ্ট কেয়ার। হুঃ! মহী দারোগা!

শ্রাবন্তী আসলে আইসক্রিম কিনতে এসেছিল মোড়ে। শর্ট-কাট পথে। সে আইসক্রিম চুষতে চুষতে এদিকে তাকিয়েই মোনাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এলো। ষষ্ঠীচরণ মোনার পাঁজরে খুঁচিয়ে মুখ ঘুরিয়ে খ্যাঁচ করে হাসল।

শ্রাবন্তী বলল, মোনাদা, এখানে কি করছেন ?

ষষ্ঠীচরণ একগাল হেসে বলল, আপনার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। হিরোদের তো ওই কাজ। হিরোইনদের জন্যে গাছতলায় দাঁড়িয়ে থাকেন।

শ্রাবন্তী ফোঁস করে উঠল।—আপনি বড্ড আজেবাজে কথা বলেন।

মোনা হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে বলল, নতুন জামাই কিনা! সব সময় মনটা রসে ভিজে আছে। কিছু মনে কোরো না শ্রাবন্তী।

শ্রাবন্তী আইসক্রিম চুষে বলল, এক্ষুণি ভাবছিলুম আপনাদের বাড়ি যাব। তা পথেই দেখা হয়ে গেল।

- ষষ্ঠীচরণ মনমরা হয়ে গেছে ধমক খেয়ে। ওর মুখ দেখে মনে হবে, নির্ঘাৎ বলছে, বইতে তোমায় কচু নায়িকা করব! ভারি আমার রূপ দেখাচ্ছে রে!

মোনা বলল, সম্ভবত কাল কলকাতায় চলে যাচ্ছি, শ্রাবন্তী।

ও-মা, সে কি! শ্রাবন্তী আঁতকে ওঠার ভঙ্গী করল।

হ্যাঁ। দেরী করে ফেললুম।

শ্রাবন্তী চোখ বড় করে বলল, কাল চলে যাবেন? প্লীজ মোনাদা, কাল নয়, পরশু যাবেন। আমি আর জলি একটা প্ল্যান করেছি জানেন না?

না তো! কী প্ল্যান?

কাল আমরা এক জায়গায় ফিষ্টি করতে যাব। সরি পিকনিক।

বল কি! আর কে যাবে?

আমি, জলি আর আমাদের কোয়ার্টারের ওখান থেকে জনাতিনেক। সেকেণ্ড অফিসারের ছেলে-মেয়ে, আমার ভাই অন্তু। এমনি কয়েকজন।...শ্রাবন্তী একটু হাসল।—বাইরের কাউকেও নেওয়া যাবে না। আপনি বাদে। আমরা বাবাকে বলে জীপটা ম্যানেজ করব। পৌঁছে দিয়ে চলে আসবে। দারুণ হবে না?

ষষ্ঠীচরণ মন দিয়ে শুনছিল। মুখটা ক্রমে গম্ভীর হয়ে গেল। শ্রাবন্তী আরও কিছুক্ষণ পিকনিক নিয়ে কথা বলে চলে গেল।

এখান থেকে মাইলখানেক দূরে নদীর ধারে একটা প্রাচীন মন্দির আছে। সেখানে অনেকটা জায়গা জুড়ে গাছপালার জঙ্গল। কবে নাকি রাজবাড়ি ছিল একটা। ইদানীং পিকনিক স্পট হয়ে উঠেছে।

তবে সেটা শীতকালেই বেশি। এখন গরম পড়ে গেছে। পিকনিকের মেজাজ নেই।

মোনা ঘুরে ষষ্ঠীচরণকে বলল, আপনি ওকে চটিয়ে দিয়েছেন। যাকগে, আমি আবার ভাব করিয়ে দেব, ভাববেন না।

ষষ্ঠীচরণ গুম হয়ে বলল, আপনি কি কাল পিকনিক করতে যাবেন নাকি?

দেখা যাক।

আমার সব গণ্ডগোল হয়ে যাবে তাহলে। ষষ্ঠীচরণ উত্তেজিত হয়ে চাপা স্বরে বলল, ভীষণ বিপদে পড়ে যাব। কারণ বুঝতে পারছেন না মানসকুমারবাবু? কত 'রিস্ক' আছে ভাবছেন না? আজ রাতে আমাকে কেটে পড়তেই হবে। এখন আপনি বলছেন কাল পিকনিকে যাবেন। ধ্যাৎ!

মোনা একটু ভেবে নিয়ে বলল, শুনুন। একসঙ্গে দুজনেই গেলে মুশকিল আছে। বরং তার চেয়ে আপনি রাতের ট্রেনে কলকাতা চলে যান। আমি ঠিকানা দিচ্ছি। খুব সোজা রাস্তা।

বাধা দিয়ে ষষ্ঠীচরণ বলল, আপনার মাথা খারাপ? সঙ্গে অত টাকা নিয়ে একা রাতের ট্রেনে! সর্বনেশে 'পেল্যান' মশাই।

মোনা ঠোঁট কামড়ে বলল, অল রাইট। টাকাটা বিশ্বাস করে আমাকে দিয়ে আপনি কলকাতা চলে যান। আমার অপেক্ষায় থাকুন। আমি কাল রাতের ট্রেনে স্টার্ট করি। কিংবা আরও একটা দিন দেরী করলে আরও ভালো। কেউ আমাকে এতে ইনভল্‌ভ বলে সন্দেহ করবে না।

ষষ্ঠীচরণ সেই হাসি হেসে বলল, বুঝেছি। নিজেকে 'সেপসাইটে' রাখতে চান।

মোনা দ্রুত সিরিয়াস হয়ে বলল, দেখুন, গরজ বা আগ্রহ যা-ই বলুন, আমার নয়। আপনার। আমি তো এ লাইনে আছিই। আপনি আসতে চাইছেন। কেমন কি না?

ষষ্ঠীচরণ ভড়কে গেল। জিভ কেটে বলল, আরে না না। ঠাট্টা করলুম। 'ইনটারেস' তো আমারই। 'চাঁস' দিচ্ছেন আপনি। সে কি বুঝি না?

মোনা একই সুরে বলল, আর একটা কথা, কোন গণ্ডগোল হলে দায়ী কিন্তু একা আপনি। আমাকে জড়াতে চেষ্টা করবেন না।

ষষ্ঠীচরণ ফোঁস করে উঠল, কক্ষনো না। আমার শ্বশুরের পয়সা আমি ওড়াব, কোন্ শালার কী? আর ওই যে বললেন আমার শ্বশুর তড়পাতে গিয়েছিল! ছাড়ুন! এ ষষ্ঠের ঘাড়ে নিজের শূর্পনখাটিকে গছিয়ে অত সহজে পার পাওয়া যায় না মশাই! আমি কি কানা, না খোঁড়া? আমার মতো বর মাথা ভেঙে রক্তারক্তি করলে জুটত, বলুন? তার দাম দিতে হবে না?

মোনা ব্যাপারটা সহজ করে দিতে হো হো করে হেসে উঠল। তারপর ষষ্ঠীচরণের হাত নিয়ে ভাবালু স্বরে বলল, অলরাইট, অলরাইট। প্লীজ ডোণ্ট বি এক্সাইটেড। লেট আস ফরগেট ইট।

ইংরেজি শুনে ষষ্ঠীচরণ খুশি হয়ে বলল, ইয়েস ইয়েস। ভেরি গুড।

মোনা তার হাত ধরে রাস্তা ছেড়ে খেলার মাঠে গাছের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াল। চাপা গলায় বলল, কিন্তু আপনার প্ল্যানটা কী? অত ক্যাশ টাকা কি বাড়িতে রেখেছেন আপনার শ্বশুর?

কুতকুতে চোখ করে ষষ্ঠীচরণ শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, বিশ্বাস হবে না শুনলে। সব টাকা ইনকাম 'টেক্সে'র ভয়ে ব্যাংকে রাখে না, বুঝলেন? ওই যে কী বলে না—'বেলাক মাণি'।

ব্ল্যাক মানি?

তাহলে আর বলছি কী? যে খাটে শ্বশুরমশাই শোয়, তার চারটে পায়ার মাথায় ইয়া মোটা সব নক্‌শাকাটা থামের মতো বানিয়েছে।

মানে, মশারিস্ট্যাণ্ডের গোড়ার দিকটায়?

ষষ্ঠীচরণ ফ্যাঁচ করল।—হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওগুলোর প্যাঁচ আছে বুঝলেন। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খোলা যায়। খাটের মোটা মোটা পায়ার মতো গর্তে নোটগুলো গোল করে ঢুকিয়ে রেখেছে। লাল সুতোয় বাঁধা মশাই! কী বুদ্ধি দেখুন!

মোনা হাসতে থাকল।—ভাবা যায় না! ভাবা যায় না! তা আপনি টের পেলেন কী ভাবে?

কী ভাবে আবার? আমার বউ কবে দেখেছিল বাবার কীর্তি। মেয়েদের পেটে কথা থাকে?

তার ওপর আপনি হলেন পতি পরম গুরু!

দুজনে খুব হাসাহাসি করল। তারপর ষষ্ঠীচরণ বলল, বউ বলল, চারটে পায়ার মধ্যে হাজার চল্লিশ তো আছেই। কবে নাকি 'টেক্সের' অপিসাররা হামলা করেছিল। কিস্যু পায়নি।

মোনা দেখল, প্রবলেম জল তাহলে। ব্যাপারটা এত সহজ সে ভাবতে পারেনি। আসলে ষষ্ঠীচরণ তত খারাপ ছেলে নয়। প্রথমে সঙ্গত এবং স্বাভাবিক ভাবেই টাকা চেয়েছে। জামাই হিসেবে এ আব্দার সে করতেই পারে। এমন কুৎসিত মেয়েকে বিয়ে করার জন্য অনেক বেশি মূল্য দাবি করতে পারে। এ তো সামান্য। মোনার যুক্তিবোধ হল এই।

তারপর মনে হল, ষষ্ঠীচরণ তার একটা ফিউচার প্রসপেক্ট। ওকে ছাড়া চলবে না। সিঙ্গিমশাইয়ের বয়স হয়েছে। যে কোন দিন স্ট্রোকে মারা পড়তে পারেন। তখন ষষ্ঠীচরণই হবে অগাধ ধন সম্পত্তির মালিক।

মোনা এদিক ওদিক তাকিয়ে কেউ চেনা-জানা তাদের লক্ষ্য করছে নাকি দেখে নিল। এদিকটায় কোর্ট কাছারি এলাকার শুরু। অচেনা লোকের ভিড় বাড়ছে ক্রমশ। বেলা দশটা বেজে এলো। আকাশের নীল্‌চে ভাবটা তেতে ধূসর হয়ে উঠছে। নীলা রেস্তোরাঁয় গণারা এগারোটা অব্দি থাকবেই। মোনা বলল, শুনুন, আজ দিনের

মধ্যে আমাদের এই লাস্ট দেখাশোনা। রিস্ক নেওয়া ঠিক নয়। আপনি রাত ক'টা নাগাদ কাজ বাগাবেন ভাবছেন?

ষষ্ঠীচরণ বলল, কাজ দিনেই বাগাবো। রাতে তো বিছানায় জেগে থাকেন। খুট্ করলেই বলেন, কে রে? দুপুরে যখন খেতে যাবেন রান্নাঘরে, তখন। কিংবা যখন বাইরে বেরুবেন বিকেলে, তখন। কিন্তু এত টাকা নিয়ে বেরুব কী ভাবে? পকেট ফুলে থাকলে শাশুড়ির চোখ পড়বেই পড়বে। খুব কড়া নজর মশাই! কাজেই···ষষ্ঠীচরণ খ্যাঁচ করে হেসে বলল, রাত ছাড়া উপায় নেই। আপনি শুধু এক কাজ করবেন। কেলাবে যাবেন সে-রাতের মতো। তারপর আপনার সঙ্গে চলে আসব। ব্যস! তারপর···

দূরে নীলা রেস্তোরাঁ থেকে গণাকে বেরুতে দেখে মোনা বাধা দিয়ে বলল, ঠিক আছে। আপনি আসুন। উইশ ইউ গুড লাক। ওকে! বাই, বাই—

বেঢপ জামা পাতলুন আর উঁচু হিল ভারি জুতো পরে ষষ্ঠীচরণ যে ভারি অসুবিধেয় পড়েছে, এতক্ষণে লক্ষ্য করল। তবু দমবার পাত্র নয় ষষ্ঠীচরণ। সাইকেল রিক্শো দাঁড় করাল। তারপর বেশ ডাঁটের সঙ্গে চেপে বসে হাত নাড়াল।

মোনা মনে মনে হেসে বলল, মাল বটে! উঃ! ভাবা যায় না! তবে ষষ্ঠীচরণকে টেমপোরারি লিস্টে রাখা চলবে না। গাই-গরুর মতো একদিন ও বিয়োবে এবং প্রচুর দুধ দেবে। কাজেই একবার স্টুডিওপাড়া ঘুরিয়ে আনতে পারলে আর চিন্তার কারণ থাকবে না। শুধু সিঙ্গিমশাই আর কত কাল বাঁচবেন, সেটাই সমস্যা।

নীলা রেস্তোরাঁর কাছে গিয়ে মোনা দেখল, গণা তাকে দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুচকি হেসে বলল, কী রে? কদ্দুর এগোলি?

মোনা বলল, কিসের?

নেকু! ওর গালে ঠোনা দিয়ে চোখ নাচাল।—মহী দারোগার মেয়ের খবর কী?

কিছু না।

না? মোনা! যতই ফেমাস হও, আর স্টার হও, ঝাঁপ্পড় খাবে। গণার কাছে পেঁয়াজি কোরো না। শুনলুম, দু'বেলা গিয়ে তোমার পা টেপাটেপি করছে!

মোনা ভুরু কুঁচকে বলল, তোরা মাইরি সেই মফস্বলী মাল থেকে গেলি! মেয়েদের নিয়ে একশো ভাবনা গজায় তোদের মাথায়। আসলে তোদের দোষ নেই, ফ্রিলি মেলামেশার স্কোপ এখানে নেই তো!

রেস্তোরাঁর ভেতর থেকে দীপু চেঁচিয়ে বলল, মোনা! কাটলেট খাবি তো আয়!

গণা চলে গেল। মোনা ভেতরে গিয়ে ঢুকল।

॥ পাঁচ ॥

গণার বুকে বেজায় দুঃখ বেজেছে। মোনা ছিল তারই বুজম ফ্রেণ্ড। অংশুরা তো পরে জুটেছিল। গণা-মোনার ভাব দেখে ছেলেবেলায় আর সব ছেলেরা একটা ছড়া বলত: গণা মোনা দুই ভাই/ব্যাং মারে ঠুঁইঠাই।

সেই মোনা হঠাৎ এমন হয়ে যাবে গণা ভাবতেও পারেনি। যে শ্রাবন্তীর জন্য তার অত মিছিমিছি কেলেঙ্কারি এবং বিনিদোষে রামপ্যাঁদানি, তার সঙ্গে মোনা একেবারে গলায় গলায় লেগে গেল? সত্যিকার বন্ধু হলে মোনা বরং এই সুযোগে একটা শোধ নেওয়ার চেষ্টা করত। কিংবা অন্তত শ্রাবন্তীর সঙ্গে গণার মুখোমুখি বোঝাপড়া করিয়েও দিত। শ্রাবন্তীকে যারা সেই সন্ধ্যায় নদীর চরে টানাটানি করেছিল, গণা যে তাদের কেউ নয়, এটা অন্তত বুঝিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারত মোনা।

শ্রাবন্তীর সঙ্গে মোনার চেনাজানা হওয়ার ফলে গণা প্রথমে এমন অনেক আশা করে বসেছিল। এমন কী, ভেবেছিল শেষ অব্দি শ্রাবন্তী তার বাবার কাছে গণার হয়ে দরবার করবে, পুলিশের ব্ল্যাক লিস্টে নাম উঠে থাকলে কাটিয়ে ছাড়বে। গণা কল্পনা করেছিল, মহী দারোগা তাকে ডেকে দু'হাত ধরে ক্ষমা চাইছেন এবং সন্দেশ খাওয়ার জন্য সাধাসাধি করছেন।

মোনার আচরণ তার ধারে কাছেও গেল না। মোনা এমন যন্ত্রের সুইচ, যা টিপলে গণার ওই স্বপ্ন সফল হয়। অথচ সুইচটা শ্রাবন্তীর মুঠোয় চলে গেছে যেন। তাই গণা মনে মনে চটেছে। মোনা যদি অন্য কেউ হত, তাকে নির্ঘাৎ স্ট্যাব করতে পিছপা হতো না।

বিকেলে অংশুদের বাড়ি গিয়েছিল গণা। অংশু নেই। জলির কাছে কথায় কথায় জানল, কাল নাকি শ্রাবন্তীদের সঙ্গে মোনা, জলি পিকনিকে যাবে। মহী দারোগা জীপও দিতে চেয়েছেন। গণা মনে মনে আরও ফুঁসে উঠল।

জলিদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গণা রাস্তার মোড়ে আকাশিয়া গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে, গীতা কলেজ থেকে ফিরছে দেখতে পেল। গণাকে দেখতে পেয়ে গীতা হাসল।—হাই গণাদা!

আজকাল মফস্বলের স্কুল কলেজে ছেলেমেয়েরা 'হাই' চালু করেছে। তাতে গীতা মিশনারী কলেজের ইংরেজি পড়া মেয়ে। তার মা নার্স। বাবা ছিলেন রেলের টিকিট চেকার। মারা গেছেন। মা ও মেয়ে মোটামুটি ডাঁটে থাকে। গীতাকে দেখামাত্র গণার মাথায় ঝিলিক দিল, তাই তো! মোনা পাঁচ-ছ'দিন হল এসেছে, গীতাকে তো তার আনাচে-কানাচে দেখা যায়নি। মোনার সঙ্গে গীতার প্রেম ছিল বন্ধুরা সবাই জানে। হঠাৎ সেই প্রেম চটার কারণ কী থাকতে পারে?

গণা ঠোঁটের কোণায় বাঁকা হেসে বলল, কী গীতু! কোথায় থাকো আজকাল? রাস্তাঘাটেও তো দেখি না।

গীতা রুমালে চিবুক স্পঞ্জ করে বলল, দারুণ গরম পড়েছে, না গণাদা? ভেরি আর্লি সামার। আকাশের অবস্থা দেখছ? অন্যবার ঠিক এ সময়টা ঝড়-বৃষ্টি হয়। গতবার এমনি কলেজ থেকে ফেরার পথে কী স্ক্যাণ্ডালাস ব্যাপার। তোমার মনে পড়ছে? সেই যে···আচ্ছা, চলি গণাদা। আবার দেখা হবে।

গণা বলল, আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও। কথা আছে। ভেরি ইমপর্ট্যাণ্ট।

গীতা পা বাড়ানোর তাল করে বলল, কোয়ার্টারে যেও'খন শুনব।

গণা গম্ভীর হয়ে বলল, বুঝেছি। বদনাম রটেছে বলে এড়িয়ে চলতে চাইছ।

আরে না না! কি বলছ গণাদা! গীতা হেসে উঠল।—তোমাকে খারাপ ভাবব কেন?

উঁহু। মহীশালা আমাকে খামোকা ব্ল্যাক লিস্টে তুলে দিয়েছে। গণা দুঃখিত ভাবে বলল, মা কালীর দিব্যি, আমাকে তো দেখে আসছ বরাবর। বল!

গীতার শিক্ষা আছে, এ শহরে এমন সব যুবকদের কেমন করে ট্যাক্‌ল্ করতে হয় জানে। অবশ্য গণা একেবারে বেলেল্লা ধরণের মস্তান নয়। হাঙ্গামা মারামারিতে অনেক সময় লিড নিলেও সাংঘাতিক ছেলে বলতে যা বোঝায়, সে তা নয়। তবু শ্রাবন্তী ঘটিত ব্যাপারটার পর থেকে গীতা গণাকে এড়িয়ে চলে। নিজের বদনামের ভয়েও বটে, আবার তার মা অঞ্জলিও বড় কড়াধাতের মহিলা।

গীতা বলল, আমি ওটা বিশ্বাস করিনি গণাদা, তোমার দিব্যি।

গণা পা বাড়িয়ে বলল, চল, যেতে যেতে বলি।

গীতা অস্বস্তিতে আড়ষ্ট হয়ে হাঁটতে থাকল।

গণা বলল, মোনার কাণ্ড শুনেছ?

না তো। কি?

মোনা মহী দারোগার মেয়ের সঙ্গে জোর জমিয়ে তুলেছে, আপন গড। শোননি?

গীতা মুখ নামিয়ে বলল, কে জানে। আমি কারো খবর রাখিনে।

গণা খিকখিক করে হাসল।—কাল ওরা পিকনিকে যাচ্ছে। জানো?

গীতা আস্তে বলল, এসব আমাকে শোনাচ্ছ কেন?

গণা বলল, ঠাকুর ঘরে কে রে, আমি তো কলা খাইনি। গীতু, এই গণা ছিল মোনার সঙ্গে একমন, এক প্রাণ। মোনার হিস্ট্রি গণার মুখস্থ।

ভ্যাট! কী সব বলছ গণাদা! চলি।

আরে শোন, শোন। এ্যাই গীতু!

গীতা বিব্রত হয়ে দাঁড়াল। তার নাসারন্ধ্র ফুলে উঠেছে। কাঁপছে। চঞ্চল দৃষ্টি। রাস্তায় লোক যাচ্ছে অনবরত। তার মধ্যে গণার সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলা!

গণা গলা চেপে বলল, আরও খবর আছে, শোনই না। ভেরি ইণ্টারেষ্টিং। শ্রাবন্তী মোনার ছবিতে হিরোইন হবে। ফাইন্যান্স করবে কে জানো? সিঙ্গিমশাইয়ের জামাই! মাইরি, তোমার দিব্যি। কথা সব পাকা।...বলে গণা সুর ধরে বলে উঠল, হায় গীতুরাণী! হলটা কি ভাবো!

গীতা দারুণ রাগতে গিয়ে হেসে ফেলল। স্রেফ বাঙালী কায়দায় বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলল, আমার ইয়েটা হল! যাও, বাজে বোকো না!

গীতা হনহন করে চলে গেল। গণা দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ হাসি মুখে। তারপর গম্ভীর হল। ভেবেছিল, গীতাকে লড়িয়ে দেবে। কিন্তু হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, গীতাও মোনার কাছ থেকে কাট মেরেছে। তলিয়ে ভাবলে ব্যাপারটা স্বাভাবিক। মোনার বিদ্যে ক্লাস এইট-নাইন, আর গীতা গ্র্যাজুয়েট হয়ে যাবে শিগগির। মোনা

যতই ফিল্মের নামে ডাঁট দেখাক, গীতা আখেরে ওকে নিয়ে ঝুলবে কেন?

অবশ্য, মেয়েদের মতিগতি বোঝা দায়। ম্যুনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হেরম্ববাবুর মেয়ে শুভাও তো গ্র্যাজুয়েট মেয়ে। ইলেকট্রিসিটির সামান্য মিস্তিরিকে নিয়ে ভেগেছিল কেন? প্রেম জিনিসটা এমনি!

গণা টের পেল একটা গভীর অসহায়তা তাকে অস্থির করছে ক্রমাগত। ক্ষেপিয়ে দিচ্ছে। থানায় মারধোর খাওয়ার পর কয়েকটা দিন ঠিক এমন অবস্থা হয়েছিল। মহী দারোগাকে স্ট্যাব করার জন্যে রাত জেগে ফিকির আঁটত। এমন কি, স্বপ্নেও দেখেছিল, মহীবাবুর গলা পেঁচিয়ে কাটছে কিন্তু রক্ত বেরুচ্ছে না।

কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক ভাবে ঘোরাঘুরি করে সে ক্লাবে গেল। তখনও কেউ আসেনি। কোবরেজ মশাই বারান্দায় ইজিচেয়ার পেতে খবরের কাগজ পড়ছেন। গণাকে দেখে বললেন, কি বাবাজী? আজ বুঝি তোমার ধুপধুনো দেবার পালা?

গণা বলল, না কোবরেজজ্যাঠা। এমনি এলুম। আপনি তো দেখেছেন, তাস-ফাস আমি খেলি-টেলি না। দীপুরা এসে ঘর খুলবে।

কোবরেজ মশাই বললেন, হ্যাঁ গো, তোমাদের ফিজিক্যাল কালচারের কি হল? মিটিং-ফিটিং ডাকলেও না।

গণা বাঁকা ঠোঁটে বলল, ধ্যাৎ ধ্যাৎ! পয়সাকড়ি কেউ দেবে না। খামোকা।

কেন? সিঙ্গির জামাইকে ধর না। সে তো রোজ এসে আড্ডা দিচ্ছে।

কোবরেজ মশাইয়ের ছোট মেয়ে মেনী দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। বলল, ও গণাদা, সিঙ্গিদের জামাইবাবুকে নিয়ে খুব গণ্ডগোল হয়েছে, জানো না?

কোবরেজ মশাই ঘোলাটে চোখ তুলে বললেন, গণ্ডগোল। কিসের গণ্ডগোল?

গণা বলল, জানি। সকালে সিঙ্গিমশাই মোনাকে শাসাতে গিয়েছিলেন নাকি।

কোবরেজ মশাই কাগজ মুড়ে রেখে বললেন, মোনা! সিঙ্গি-বাড়িতে গণ্ডগোল হল, তুমি বলছ মোনাকে শাসাতে গিয়েছিল নাহু সিঙ্গি! খুলে বল তো বাবাজীবন?

মেনি বলল, না বাবা, দুপুরবেলা। সকালে না।

গণা তাকাল।—দুপুরবেলা? কি হয়েছে?

সিঙ্গিদের জামাইবাবু টাকা চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে।··· মেনি খিলখিল করে হেসে উঠল।—কমলার মা গিয়েছিল যে। শুনে এসে বলল। বলল, ঘরে তালা আটকে বন্ধ করে রেখেছে। হেমাদি কান্নাকাটি করছে।

গণা বলল, বলিস কী!

কমলার মা বলল, খাটে টাকা লুকোনো ছিল। জামাইবাবু হাতে নাতে ধরা পড়েছে। সিঙ্গিমশাই বলেছে, পুলিশে দেবে।

গণা এবং কোবরেজমশাই হেসে উঠলেন। গণা বলল, যাঃ। নিজের জামাইকে কেউ পুলিশে দেয় নাকি?

মেনি অপ্রস্তুত হয়ে হাসল। কোবরেজমশাই হাসি থামিয়ে গলা টিপে বললেন, তবে কিচ্ছু অবিশ্বাসের নেই। বুঝেছ বাবাজীবন? ওর নাম নাহু সিঙ্গি। ও সব পারে। বিশেষ করে টাকাপয়সা ওর প্রাণ।

গণা বলল, তাই বলে একমাত্র মেয়ে। ঘরজামাই। তাকে পুলিশে দেবে কি!

কোবরেজমশাই ফোকলা হেসে বললেন, দেখা যাক। নাহু বড় পাষণ্ড লোক।

গণা তখুনি উঠে পড়ল। ব্যাপারটা সে আঁচ করেছে। ষষ্ঠীচরণকে

মোনা' এমন তাতান তাতিয়েছে যে বেচারার আর জ্ঞানগম্যি বলতে কিছু বাকি নেই। যাই হোক, খবরটা মোনাকে দেওয়া যাক। খুব জমে যাবে।

কিন্তু যেতে হল না। কয়েক পা এগোতেই মোনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মোনা অস্থিরতা বুকে নিয়েই ক্লাবে আসছিল।

ষষ্ঠীচরণ টাকা নিয়ে ক্লাবে আসবে এবং মোনা তাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরবে। এই ছিল প্ল্যান। মোনা ধৈর্য ধরতে পারছিল না। ছ'টা বাজতে না বাজতে বেরিয়ে পড়েছে। শরীরটা কেমন ভারি ভারি লাগছে।

সামনে গণাকে দেখে সে শুকনো হাসল। তারপর ক্লাবের বারান্দা শূন্য দেখে বলল, কেউ এখনও আসেনি দেখছি রে! আয়, ক্যারাম খেলি।

গণা ওর একটা হাত ধরে টেনে রাস্তার ধারে নিয়ে গেল। তারপর চাপা হেসে ফিসফিস করে বলল, মোনা শুনেছিস! সিঙ্গির জামাই টাকা চুরি করতে গিয়ে নাকি ধরা পড়েছে। ঘরে তালা এঁটে বন্ধ করে রেখেছে তাকে। তারপর নাকি সিঙ্গি পুলিশ ডাকতে গেছে।

মোনা কাঠ হয়ে গেল। কিন্তু তখুনি সামলে নিয়ে বলল, সো হোয়াট?

গণা খিকখিক করে হাসতে থাকল।—তোকে জড়ায় না যেন। সিঙ্গির জামাই মাইরি রামছাগল।

মোনা চটে গিয়ে বলল, ওর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক?

সিঙ্গি বলছে, তুই-ই নাটের গুরু। ওর জামাইকে ভুজুংভাজুং দিয়ে তুইই পটিয়ে-টটিয়ে এ সব করিয়েছিস।

মোনা গুম হয়ে বলল, যত সব মফস্বলী কারবার! কোন মানে হয়?

বলে সে হনহন করে ফিরে চলল। গণা তার সঙ্গ নিয়ে বলল,

যা বাবা! তুই যে আমারই ওপর খাপ্পা হয়ে গেলি! এই হয় রে সংসারে!

মোনা কোন জবাব দিল না। জোরে হাঁটতে থাকল। গণা কিছুদূর পাশে-পাশে হেঁটে গিয়ে হঠাৎ দাঁড়াল। সেও রেগে গেছে।

মোনা রাস্তার মোড় পেরিয়ে অদৃশ্য হলেও গণা কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। সবে আলো জ্বলেছে রাস্তায়, দোকানপাটে, ঘরবাড়িতে। কেমন গুমোট হয়ে আছে আবহমণ্ডল। পশ্চিমে নদীর ওপর আকাশে লাল্‌চে আভার ওপর কালো মেঘ জমেছে। বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে। ঝড়বৃষ্টি হবে নাকি?

ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে গণা দীপুদের বাড়ি ঢুকল।…

রাতে সামান্য একটু ঝড়বৃষ্টি হল। মোনার মনেও সেই অবস্থা। ষষ্ঠীচরণ সত্যি একটা রামছাগল। মাঝখান থেকে মোনা কত লম্বাচওড়া স্বপ্ন দেখে ফেলল। এখন সব বরবাদ। শেষ রাতের দিকে মোনা শান্ত হয়েছিল। যাক গে, সেই শেষ ভরসা নিজের ওপর। ফের একবার বাবা-মা দাদা-বউদিদের সাধাসাধি করে অন্তত হাজার দুই টাকা বাগাতেই হবে। অবনীদাকে আশা দিয়ে এসেছে কি না, অন্তত একদিনের শুটিং খরচ সে যোগাড় করে আনবেই। বার বার অবনীদার চেহারাটা সামনে ভেসে উঠছে। আর বার বার মোনা মাথার ভিতর দিকে খোঁচা খাচ্ছে। এই করে কখন ঘুম এসে শান্তি দিয়েছিল।

সেই ঘুম ভাঙল মেজবৌদির ডাকাডাকিতে।

মোনা দরজা খুলে বলল, কী মাইরি জ্বালাতন কর তোমরা।

শান্তা বলল, এই নিয়ে তিনবার ডাকতে এসেছি। বলেছিলে না সাতটার মধ্যে উঠিয়ে দিতে? সাড়ে সাতটা বাজে। দেখ গে, তোমায় ফেলে তোমার পিকনিক পার্টি কখন চলে গেছে।

মোনা হাই তুলে বলল, কেউ আসেনি ওরা?

শান্তা চা-ব্রেকফাস্ট এনেছে। টেবিলে রেখে মিষ্টি হাসল। তোমার হিরোইন আসেনি। জলি একটু আগে এসেছিল। রেডি হয়ে থাকতে বলে গেল।

মোনা বাথরুমে ঢুকল। অনিচ্ছার ভাব তাকে জড়িয়ে আছে। চোখ জ্বালা করছে। ষষ্ঠীচরণ সাকসেসফুল হলে, আজ কী দিনটাই না আসত জীবনে! শ্রাবন্তীর সঙ্গে একটু আধটু ফিল্মী কায়দায় প্রেমের ঢঙ করতে আপত্তি ছিল না। মনে টাকার ভাবনা থমথম করছে বলেই তো আর কিছু ভাবা যাচ্ছে না। দাঁতে ব্রাশ ঘষতে ঘষতে হঠাৎ থেমে আনমনে মোনা একবার ভেবে নিল, শ্রাবন্তীর মধ্যে কী একটা আছে অস্বীকার করা যায় না। বেশ টান লাগে। তা না হলে কি এই সাত সকালে উঠে পিকনিকে দৌড়ুত?

কিছুক্ষণ পরে মোনা সেজেগুজে নীচে নেমে এলো। জলি বউদিদের সঙ্গে গল্প করছে। মোনাকে দেখে বলল, রেডি?

বারান্দায় খাবার সময় অমল হঠাৎ ঘর থেকে ডাকল, মোনা, শুনে যা।

মোনা জলিকে এগোতে ইশারা করে বলল, কী?

অমল গলা চেপে বলল, পিকনিকে যাচ্ছিস, যা। কিন্তু একটু সাবধান করে দিচ্ছি, মহী মহা খচ্চর লোক। দেখিস যেন ফ্যাসাদে পড়িসনে!

মোনা ভুরু কুঁচকে বলল, তার মানে?

অমল রাগ করে বলল, অত বলা যায় না তোকে। তুই আমার ছোট ভাই না হলে ইনিয়ে বিনিয়ে বলতুম। ওই মেয়েটা ডেঞ্জারাস মনে রাখিস!

মোনাও পাল্টা চটে বলল, মাইরি মেজদা! তোমরা সত্যি একেবারে আলুর বস্তা ছাড়া কিছু নও। বলে সে হনহন করে এগিয়ে গেল।

পিছনে অমল গম্ভীর হয়ে মায়ের উদ্দেশে বলল, মোনা কী বলল শুনলে? আলুর বস্তা! আমাকে আলুর বস্তা বলল! ইডিয়েটের কী স্পর্ধা হয়েছে দেখছ?

শান্তা শুনছিল। ধমক দিয়ে বলল, বাজারে যাবে, না লেকচার ঝাড়বে!

অমলের দাপট আছে, কিন্তু এখানে সে কেঁচো। ঠাণ্ডা হয়ে বলল, এই তো থলে হাতে বেরুচ্ছি দেখছ।

মোনা বেরিয়েই রিক্‌শো ডেকেছে। জলির একটু আপত্তি ছিল অবশ্য। দাদার বন্ধু এবং ইদানীং এ শহরে যুবক-যুবতীদের মধ্যে ঈষৎ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, এমন যুবকের সঙ্গে রিক্‌শো চেপে যেতে কেমন যেন লাগে। চোখ পড়বে কতজনের। কিন্তু মোনার হুকুম না মেনে উপায় নেই।

থানার কোয়ার্টারের পিছনের রাস্তায় রিক্‌শো থেকে নামল ওরা। জলি বলল, ওই যে ওরা। এসো মোনাদা।

বারান্দা থেকে দৌড়ে এলো শ্রাবন্তী। মোনা ঘড়ি দেখে বলল, এ্যাম আই লেট? শ্রাবন্তী বলল, না। জীপটার জন্যে অপেক্ষা করছি। বাবা বেরিয়েছেন। এক্ষুনি এসে পড়বেন। ততক্ষণ মায়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।

শ্রাবন্তীর অনেকগুলো ভাইবোন। শ্রাবন্তীই বড়। মোনা টের পেল, সবাই যাবে বলে সেজেগুজে রেডি। সেকেণ্ড অফিসারের ছেলেমেয়েরাও সংখ্যায় তিন। কোন এক স্কুল টিচারেরও নাকি পিকনিকে নেমন্তন্ন। এখনই এসে পড়বেন। মোনা ও জলি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছিল। এমন জানলে এড়িয়ে যেত। এই বিশাল বাহিনী নিয়ে পিকনিকে যাওয়ার মানেটা কী?

তবে মোনা একটা ব্যাপারে খুশি হল। তাকে আণ্ডাবাচ্চা থেকে শুরু করে সবাই বড্ড বেশি খাতির করছে। তার দিকেই সারাক্ষণ চোখ। সেকেণ্ড অফিসারের দুই মেয়ে শমিতা আর নমিতা অটো-

গ্রাফের খাতাও নিয়ে এলো হাঁফাতে হাঁফাতে। মোনা জীবনে প্রথম অটোগ্রাফ দিল। হাত কাঁপছিল তার।

একটু পরে শ্রাবন্তীর মা এলেন। ফর্সা সুশ্রী চেহারা, একটু রোগা। কিন্তু কি অমায়িক। মোনা কখনও পুলিশ ফ্যামিলিতে মেশার সুযোগ পায়নি। তার অনেক অদ্ভুত ধারণা ছিল মাথায়। শ্রাবন্তীর মায়ের পায়ের ধুলো নিল ঝটপট। ফের চা এবং সন্দেশ এলো একপ্রস্থ। শ্রাবন্তীর মা সামনে বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মোনার খবর নিচ্ছিলেন। সেই ফিল্ম ম্যাগাজিনটার কথাও বললেন। বললেন, আলাপ যখন হল, যাব তোমাদের বাড়ি। নিশ্চয় যাব।

স্কুলের দিদিমণি এলেন এতক্ষণে। মোটাসোটা প্রৌঢ় ভদ্রমহিলা। বিধবা বলেই মনে হল। মোনা অবাক। ইনি কেন পিকনিকের দলে নাম লেখালেন, সে বুঝতে পারছিল না। বুঝল একটু পরেই। ভদ্রমহিলা মোনাকে নমস্কার করে বললেন, আপনিই মানসকুমার? খুব আনন্দ হল। খুব আনন্দ হল। আপনার অনেক বই আমি দেখেছি।

সর্বনাশ! মোনা প্রমাদ গণল। নিশ্চয় কোথাও ভুল হয়েছে। আমতা হেসে বলল, মানে, আমি জাস্ট সবে···

কথা কেড়ে ভদ্রমহিলা বললেন, স্বচক্ষে দেখা, আর ছবিতে দেখা কত পার্থক্য!

জলি হেসে বলল, ও অর্চনাদি, ছবিতে দেখাটা বুঝি স্বচক্ষে দেখা না?

অর্চনাদি বললেন, কথার কথা বলছি। যাক গে, সত্যি বলতে কী, আপনার জন্যেই শিঙ ভেঙে বাছুরের দলে ঢুকেছি ভাই। আমি ভীষণ বই দেখি। আমার দুর্নাম বল, সুনাম বল, এই। আজ বাদে কাল মরে যাব। নির্দোষ আনন্দ করেই মরি। কী বল ভাই অঞ্জু?

শ্রাবন্তীর মা হেসে বললেন, তুমি আমাকেও ভাই বলবে, আর

আমার মেয়েকেও ভাই বলবে, আবার মেয়ে তোমাকে অর্চনাদি বলবে। বাঃ! আজ তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া হোক!

অর্চনাদি বললে, তাতে দোষ নেই। কই গো শ্রাবন্তী, আর দেরী কত? রোদ চড়লে কষ্ট হবে যে!...

কিছুক্ষণ পরে বাইরে জীপের শব্দ হল। ছেলেমেয়েগুলো হইহল্লা করে বেরুল। তারপর লম্বা ঢ্যাঙা মহী দারোগা বুটের শব্দ তুলে ঘরে ঢুকলেন। মোনাব দিকে আড়চোখে তাকাতে মোনা একটু চমক খেল। পুরনো অভ্যাস ছেলেবেলার। থানার আমগাছগুলো তারাই ন্যাড়া করে ফেলত প্রতি গ্রীষ্মে। কনস্টেবল ছিল একজন রামধরজী নামে। তাকে হাত করেছিল স্কুলের ছেলেরা।

শ্রাবন্তী বলল, বাবা, এই সেই মোনাদা।

মোনা তড়াক করে উঠে হেঁট হয়ে বুটজুতো দুটো ছুঁয়ে মাথায় হাত ঠেকাল। মহীবাবু বেটনসুদ্ধ হাতটা ওর কাঁধে রেখে ওঠালেন।—হয়েছে, হয়েছে। তারপর স্ত্রীর দিকে ঘুরে বললেন, বাবাজীকে চা-ফা খাইয়েছ তো?

মোনা বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ। আপনাকে ভাবতে হবে না।

মহী দারোগা স্ত্রীর পাশে বসে হাঁটু এবং বেটন দোলাতে দোলাতে বললেন, মানুষ কী হতে চায়, কী হয়ে যায় বাবা! এই ধর, নিজের কথাটা বলি। স্টুডেন্ট লাইফে খেলাধুলো থিয়েটার এ সবেতে কী নেশা যে ছিল ভাবতে পারবে না। পরে শালা পুলিশের চাকরি নিয়ে জীবনটা 'হেল' হয়ে গেল। ক্রিমিন্যাল ঘাঁটতে ঘাঁটতে নিজেই ক্রিমিন্যাল হয়ে গেলুম। হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ!

তক্ষুনি গম্ভীর হয়ে ফের বললেন, তবে থিয়েটারের টানটা বরাবর ছিল। কেষ্টনগরে থাকতে একটা পার্মানেণ্ট স্টেজ করে দিয়েছিলুম পর্যন্ত। আজকাল বয়েস হয়েছে। তাতে তোমাদের এই এলাকাটা এত ঝামেলার জায়গা, বহুতব্য নয়। ইচ্ছে করলেও—

মোনা বলল, নেতাজী ক্লাব আছে জানেন তো আমাদের পাড়ায়? ওখানে…

কথা কেড়ে মহীবাবু বললেন, জানি। তবে কথাটা হচ্ছে কী জানো? ছেলেছোকরাদের সঙ্গে এ-বয়েসে থিয়েটার করা পোষায় না। আমরা বরাবর ঐতিহাসিক বই-ই করেছি। বঙ্গে বর্গী, সিরাজদ্দৌলা, শাজাহান। আজকাল কী সব বই হয়েছে, মাথামুণ্ডু নেই!

শ্রাবন্তী এসে বলল, মোনাদা, সব রেডি।

মহীবাবু বললেন, হ্যাঁ, এসো তাহলে। ফেরার পথে চা খেয়ে যেও অতি অবশ্য। শাবু, দাদাকে ছাড়বিনে! তুমি তো বাবা ফিল্মে পার্ট কর দেখলুম। ম্যাগাজিনে ছবি বেরিয়েছে। দেখে খুব আনন্দ হলো। এ সব তো যার-তার কম্মো নয়। ট্যালেণ্ট থাকা চাই। অভিনয়শাস্ত্রে পারদর্শিতা কি সহজ কথা?

মোনা বেরুল। একটা জীপে ছোট-বড় মিলিয়ে জনা এগারো ঢুকেছে। মোনার জায়গা সামনে রাখা আছে। তার পাশে বসার জন্যে সেকেণ্ড অফিসারের ছেলে দেবু আর শ্রাবন্তীর ভাই নীলুর মধ্যে খণ্ডযুদ্ধের উপক্রম। শেষ অব্দি দুজনকে দুপাশে নিয়ে মোনা রফা করল। জীপের ক্যাম্বিশের ছাদ নুয়ে গেছে হাঁড়িভর্তি বস্তার চাপে। জীপ স্টার্ট দিল। মোনা দেখল, মহীবাবু আর তাঁর স্ত্রী বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাত দোলাচ্ছেন। মোনা হাত দুলিয়ে দিল। ছেলেমেয়েরাও হাত নেড়ে টা টা করে চেঁচাল।

বড় রাস্তায় পৌঁছে মোনা ঘুরে শ্রাবন্তীর উদ্দেশে বলল, তোমার বাবা ভালো অভিনেতা ছিলেন, বলনি তো শ্রাবন্তী?

শ্রাবন্তী বলল, হাতি! মোহনপুরে থাকতে একবার দেখেছিলুম মন্ত্রীর পার্ট—

মোনা বলল, এই! বাবাকে হাতি বলে না। পাপ হয়।

হাসির ধুম পড়ে গেল জীপের মধ্যে। সেটা সামলে ড্রাইভার বলল, বাবুসাব! হাম তো পয়লা আপকো দেখকার বহুৎ চমক

খায়া। আরে! বিনোদ খান্না কাঁহাসে আয়া হিঁয়া পর?
তাজ্জব!

মোনা শুকনো হাসল। খালি ড্রাইভারদেরই এমন ভুল কেন হয়, আর কারুর হয় না—এটাই অবাক লাগার মতো ব্যাপার।…

রাতের বৃষ্টিটা আকাশ ও পৃথিবীর চেহারা বদলে দিয়েছে আজ। শেষ বসন্তে গাছপালার পাতায় যে রঙ ধরেছিল, তার জেল্লা খুলে গেছে। ধুলো নেই একটুও। ঘাসের চেকনাই দেখাব মতো। নদীব ধারে প্রাচীন পোড়ো মন্দিরের মাথায় ডালপালা ছড়ানো বিশাল বটগাছ। অজস্র ঝুরি নেমেছে। নদীর ধার ঘেঁষে পাড়ের ওপব যেখানে ঘন ছায়া জমে আছে, সেখানেই সতরঞ্চি পাতা হয়েছে। মেয়েরা রান্নার যোগাড়ে ব্যস্ত। ছোট ছেলেমেয়েরা চরে নেমেছে। নদী প্রায় শুকনো। একপাশে দহের মতো। টলটলে স্বচ্ছ জলে ভরা। তার দু' মাথায় তিরতিরে এক ফালি করে স্রোতের রেখা।

আজ হাওয়ায় ঠাণ্ডা আমেজ। পাখপাখালি ডাকছে। মোনা একটু দূরে একটা ঝুরিতে হেলান দিয়ে সিগারেট টানছিল। হ্যাঁ, এই পিকনিকটা নিশ্চয় আনন্দের ব্যাপার। কিন্তু মনে স্বস্তি নেই। টাকার চিন্তা কুরে খাচ্ছে। ষষ্ঠীচরণ স্বপ্নের পুরীতে ঠেলে তুলে দিয়েছিল। এখন মোনা ধপাস করে পড়েছে।

মাঝে মাঝে কাজ ফেলে কোমরে আঁচল জড়ানো শ্রাবন্তী যেন প্রচুর মায়া ছড়াতে ছড়াতে তার কাছে এসে দু-চারটে কথা বলে চলে যাচ্ছে। সত্যি, এ মুহূর্তে তাকে ভালো-টালো বাসতে ইচ্ছে করে। কিন্তু এ সব তো ক্ষণস্থায়ী। কলকাতায় তার প্রাণটা আটকে আছে, এখানে নিছক তার শরীরটা ধান্দায় এসেছে।

ফের শ্রাবন্তী এসে বলল, মোনাদা, আপনাকে একটা কথা ক'দিন থেকে খালি জিজ্ঞেস করব ভাবছি, আর ভুলে যাচ্ছি!

মোনা বলল, কী বল তো?

আপনি নিশ্চয় গাইতে পারেন?

তাই বল! মোনা হাসল।—গান-টান বিশেষ আসে না।

হতেই পারে না। ফিল্মের লোকে গান গাইতে জানে না আবার?

সত্যি, জানি না।

বিশ্বাস করি না।

তোমার গা ছুঁয়ে বলছি। বলে মোনা হাত বাড়াল।

শ্রাবন্তী একটু সরে বলল, এই! ওরা দেখে কী ভাববে!

মোনা ভিলেনের ভঙ্গীতে হাসল।—তুমি নেহাৎ দারোগাবাবুর মেয়ে, নৈলে…

নৈলে কি? বলুন!

এই! ফের আপনি বলছ শ্রাবন্তী!

থুড়ি! নৈলে…কি? বল?

নৈলে তোমাকে ইলোপ করতুম।

শ্রাবন্তী রাঙা হয়ে বলল, যাঃ!

মোনা কাঁধ ঝাঁকি দিয়ে বলল, হুঁউ। এতেই লাল টুকটুকে হয়ে গেলে! তবে যে বলেছিলে, হিরোইন হবে! ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে কত প্রেমের কথা বলতে হয় জানো তো?

দায় পড়েছে ন্যাকা ন্যাকা বানানো কথা বলতে।

গুউড্! মোনা হাতে তালি বাজাল।—তবে সত্যিকার কথাই বল।

শ্রাবন্তী আরও রাঙা হয়ে দৌড়ে চলে গেল আসরে। তারপরই পিছন থেকে চাপা গলায় কেউ ডাকল, মানসকুমারবাবু!

মোনা চমকে উঠে পিছু ফিরে দেখে, একটু তফাতে ভাঙা পাঁচিলের ওপর ঝোপের আড়ালে হনুমানের মতো বসে আছে ষষ্ঠীচরণ। হাত ইশারা করছে। মোনা হাঁ করে তাকাল।

ষষ্ঠীচরণ ঘন ঘন হাত নাড়ছে। মোনা বিরক্ত মুখে তার দিকে এগোল।

ষষ্ঠীচরণ বলল, দয়া করে পাঁচিল পেরিয়ে এপারে আসুন। খুব 'পেরাইভেট কনসাল' আছে। কেউ যেন টের না পায়।

মোনা বলল, বলুন না এখানেই।

উঁহু! খুব 'পেরাইভেট'! টাকার ব্যবস্থা প্রায় করে ফেলেছি।

এবার মোনার ভেতর সেই লোভটা সঙ্গে সঙ্গে চনমন করে উঠল। সে ভাঙা পাঁচিল পেরিয়ে ওপাশে নামল। ঘন ঝোপ আর গাছপালা গজিয়ে আছে ইঁটের পাঁজার ওপর। এটাই নাকি সেই রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ।

ষষ্ঠীচরণ বলল, উঃ, কি ভাবে যে খবর যোগাড় করে এনেছি, কহতব্য নয়।

সে ফ্যাঁচ করে হাসল।—ধরা পড়ে লজ্জায় কাল দুপুর থেকে রাত নটা অব্দি ঘরে খিল আটকে বসে ছিলুম। শেষে শাশুড়ি মাথা খুঁড়ে দরজা খোলালেন!

মোনা একটু হাসল।—তাই নাকি? আমি শুনেছিলুম, আপনাকে ঘরে আটকে পুলিশে খবর দিতে গেছেন সিঙ্গিমশাই!

ষষ্ঠীচরণ হাসির চোটে দুলতে থাকল।—আরে লা লা। মোটেও তা লা। হাসিতে চুবিয়ে 'না' কে একেবারে 'লা' করে ফেলল সে। তারপর বলল, যাক্ গে। এবার কাজের কথা বলি। আমি তো হার মানলুম। এবার আপনাকে নামতে হবে। উঁহু, ভড়কাবেন না। খুব সোজা। ডালভাত। ভয়ের কিছু নেই মশাই! আমি আর আমার বউ আপনার সাপোর্টে থাকব। বউয়ের সঙ্গে সেকথা না হয়ে কি এমন দৌড়ুতে দৌড়ুতে আসছি? বউ-ই এ বুদ্ধি বাৎলে দিয়েছে।

মোনা কৌতূহলী হয়ে বলল, বলুন।...

॥ ছয় ॥

সকালে অমল বাজারের থলি হাতে বাড়ি ঢুকে গলা তুলে বলল, রাতে এক কাণ্ড হয়ে গেছে শুনে এলুম।

অধীরবাবু স্নান করছিলেন। বললেন, কি রে অমু?

রঞ্জন বেরিয়ে বলল, তুই কোথা শুনলি রে অমু? আমি তো কাকেও বলিনি!

অমল অবাক হয়ে বলল, তোমার আবার কি হল? আমি বলছি অন্য কথা।

রঞ্জন উঠোনে নেমে হাসফাঁস করে বলল, আমার রিভলবারটা চুরি গেছে। নিশ্চয় এ মোনার কীর্তি। সব চেপে আছি। উঠুক মোনা। তারপর কথা। হয় আমি এ বাড়ি থাকব নয় মোনা!

অমল ঠোঁটে আঙুল রেখে বলল, চুপ চুপ, সাংঘাতিক ব্যাপার তাহলে।

রঞ্জন বলল, নো চুপ! চুপ কিসের রে? মোনা নিশ্চয় গণার মারফত কোন গুণ্ডাকে বেচেছে। টাকা চাইছিল, দিইনি। সেই রাগে এই কাণ্ডটি করেছে। আমি এক্ষুনি থানায় যাচ্ছি।

অমল বলল, আহা শোনই না, কাল রাতে সিঙ্গিবাড়ি ডাকাতি হয়েছে।

রঞ্জন বলল, মোনা— মোনা করেছে। মোনা ছাড়া কেউ না।

অধীরবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, আহা আমি দেখছি মোনাকে। চুপ কর!

অমল বলল, রাতে মুখোস পরা ডাকাত ঢুকেছিল সিঙ্গিমশাইয়ের ঘরে। দরজা নাকি খোলাই ছিল। ছোরা পিস্তল-টিস্তল দেখিয়ে টাকা নিয়েছে। সিঙ্গিমশাই সেই রাতে থানায় গিয়েছিলেন। পুলিশ এসে সব দেখেশুনে ওর জামাইকেই এ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে।

বাড়িতে ঘোর স্তব্ধতা ঘনাল কিছুক্ষণ। যে যেখানে ছিল, চুপ। বড় বড় চোখ। তারপর করুণাময়ী বারান্দার চেয়ারে বসে পড়লেন। অধীরবাবু গুম হয়ে গায়ে জল ঢালতে থাকলেন। অমল থলে রেখে বউকে বলল, কই, টাকা দাও।

রঞ্জন ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে চাপা গলায় বলল, বাড়িসুদ্ধ জেল খাটতে হবে। মান গেল, সম্ভ্রম গেল। গুষ্ঠীর ষষ্ঠীপুজো হয়ে গেল ওই বাঁদরটার জন্যে। ছ্যা ছ্যা! দত্তবাড়ি রসাতলে পাঠিয়ে দিলে হতচ্ছাড়াটা!

মোনা কান করে শুনছিল। দুমদাম করে নেমে এসে বলল, বড়দা! কি বলছিলে যেন, আমি রিভলবাব চুরি করেছি না কি?

রঞ্জন বলল, আলবাৎ করেছিস! ভোরবেলা বালিশের তলা খুঁজে দেখি নেই। অথচ রাতে বালিশের তলায় রেখে শুয়েছিলুম। গেল কোথায় সে জিনিস?

মোনা বলল, ভালো করে খুঁজে দেখে বলছ? আশ্চর্য! তুমি দাদা না কি? তুমিই আমার হাতে হাতকড়া পরিয়ে ছাড়বে দেখছি!

রঞ্জন ওর কথার সুরে একটু দমে গিয়ে বলল, সব খুঁজেছি। পাইনি।

শান্তা বলল, সেবার তো ঠাকুরপো ছিল না, এমনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। শেষে বুলুর খেলনার বাক্স থেকে বেরুল। আপনার বড্ড ভুলো মন কিন্তু!

অমিতা এতক্ষণে মুখ খুলল।—ভাগ্যিস গুলি-টুলি পুরে রাখতে দিইনে। নইলে কি হত ভাবো তোমরা। কবে দিয়ে আসব নদীতে ফেলে। লোকে বন্দুক কেনে, আর উনি কিনেছেন রিভলবার, রি-ভ-ল্-বার! আমার মুণ্ডু!

মুখ খুললে অমিতা বাঘিনী। রঞ্জন ঘরে গিয়ে ঢুকল। মোনা কিচেনের বারান্দায় এসে বলল, কি বলছিলি মেজদা? সিঙ্গিবাড়ি ডাকাতি হয়েছে?

অমল সন্দিগ্ধমুখে বলল, হ্যাঁ রে, এতে গণা-টনার হাত নেই তো? আজকাল সিঙ্গির জামাই নাকি রোজ এসে আড্ডা দিত ওদের ক্লাবে।

মোনা বাঁকা ঠোঁটে বলল, কে জানে! আমি ও সব খবর রাখিনে। বউদি ব্রেকফাস্ট রেডি?

শান্তা মিষ্টি হেসে বলল, অনেকক্ষণ।...

একটু পরে রঞ্জনের আওয়াজ এলো ওপাশের ঘর থেকে।—কী আশ্চর্য! এখানে কী ভাবে এলো জিনিসটা? এঁ্যা! ডানা গজিয়েছিল? রেখেছিলুম বালিশের তলায়। স্পষ্ট মনে আছে। দোকান থেকে ফিরেই জামা ছাড়ার সময় আগে বালিশের তলায় ঢুকিয়ে রাখি। তারপর অন্য কাজ।

অমল বলল, পেলি নাকি বড়দা? যাক গে বোস, মোনার জন্যে বড় ভাবনায় পড়েছিলুম।

মোনা উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, আমি তোমাদের চক্ষুশূল, জানি। সেজন্যেই তো দূরে সরে গেছি।

করুণাময়ী ফোঁস করে নাক ঝেড়ে বললেন, আমাকেও নিয়ে যাস মনু। বিনুর কাছে গিয়ে আমিও থাকব। বাড়ি ভরা শত্তুর সব! খামোকা...

শান্তা বলল, আহা, আপনার আবার কী হল? চুপ করুন তো একটু।

করুণাময়ী কান্না চেপে শান্তার মেয়েকে কোলে নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন।

রঞ্জন বেরিয়ে এলো রিভলবারটা হাতে নিয়ে।—দেখছিস অমু? কি বলব বল? বাড়িতে নিশ্চয় ভূত আছে। রাখলুম বালিশের তলায়, পেলুম তোষকের তলায়!

অমল হাসতে লাগল।—তাহলে তুমিই রেখেছ আনমনে। যাকগে, চেপে যাও।

মোনা চা শেষ করে শিষ দিতে দিতে ওপরে নিজের ঘরে গেল।

সিগারেট টানবে কিছুক্ষণ। তারপর বেরুবে। তার মনে ঝড় বইছে। ষষ্ঠীচরণকে কি ভাবে সন্দেহ করল পুলিশ? অস্বস্তিতে হাত-পা কাঁপছে।

শান্তা এসে চাপা গলায় ডাকতেই মোনা চমকে উঠল। শান্তা ফিসফিস করে বলল, এই বাঁদর ছেলে! তুমিই সিঙ্গিবাড়ি ঢোকনি তো?

মোনা বলল, ভ্যাট্! আমি···আমি কেন? কী বলছ!

তাহলে রিভলবার কেন চুরি করালে আমাকে দিয়ে? আমার এখন ভীষণ ভয় করছে জানো?

আরে না না। বললুম না, গণাদের সঙ্গে তক্কো হয়েছিল। রিভলবার নাকি পাঁচঘরার বেশি হয় না। ছ'ঘরা রিভলবার হয় ওরা বিশ্বাসই করছিল না। তখন বাজী ধরা হলো দশ টাকা···

শান্তা বলল, তা তো তুমি বললে। কিন্তু কেন যেন বিশ্বাস হচ্ছে না।

মোনা হাত বাড়িয়ে বলল, তোমায় ছুঁয়ে বলছি! মাইবি!

শান্তা জানালার দিকে তাকিয়ে ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে চলে গেল। মোনা গুম হয়ে সিগারেট টানতে থাকল। ষষ্ঠীচরণটা সত্যি রামছাগল। শেষে কি গণার মতো তাকেও মতী দারোগার প্যাঁদানি খেতে হবে? বরং তার চেয়ে এক্ষুনি কলকাতা চলে যাওয়া ভালো। মোনা গোছগাছে ব্যস্ত হল।

অধীরবাবু গোডাউনের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। ডালের বস্তা কাঁটায় চাপিয়ে ওজন হচ্ছে। ইদানীং পথে ওজন কমে যায় বস্তার। গা-ময় মাকুর খোঁদল। রঘু কয়াল ওজন হাঁকছে। রামপদ নোট-বুকে টুকছে।

সেই সময় বেচারাম ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এলো।—কত্তাবাবু, কত্তা-বাবু! ছোটবাবুকে ধরে নিয়ে গেল। শিগগির আসুন!

অধীরবাবু হাঁ করে তাকালেন।—এঁ্যা!

হ্যাঁ কত্তাবাবু। বেচা ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল।—ছোটবাবুকে থানায় ধরে নিয়ে গেল। সিঙ্গিশালার জামাই প্যাঁদানির চোটে ছোটবাবুর নাম করেছে।

অধীরবাবু বললেন, থাম হতভাগা! রামপদ, আমি আসছি।

বেচা বলল, যাই, বড়বাবু মেজবাবুকে খবর দিইগে। তারপর সে তেমনি দৌড়ুল। অধীরবাবু রাস্তায় গিয়ে ধীরে সুস্থে একটা রিক্‌শা ডেকে দাঁড় করালেন। তারপর গদীতে ফিরে গিয়ে আয়রণ চেস্টের তালা খুলে একতাড়া নোট ফতুয়াব মধ্যে চালান করলেন। থানায় খালি হাতে যেতে নেই।

থানা এখান থেকে সোজা বাস্তায় গেলে বেশি দূরে নয়। নদীর ধার বরাবর সরকারী আপিস এলাকা। সেখানেই থানা। বাড়ি ঘুরে খোঁজখবর নিয়ে গেলে ভালো হত। কিন্তু বাড়িতে না জানি কী অবস্থা। করুণাময়ী হয়তো মড়াকান্না কাঁদছেন। যাক্ গে, আগে থানায় সব ম্যানেজ করে তখন বাড়ি ঢোকা যাবে।

গেটের মাথায় বুগেনভিলিয়ার ঝাড় লাল ফুলে রাঙা হয়ে আছে। সেন্ট্রি সঙ্গীন উঁচিয়ে পাহারা দিচ্ছে। কাঁপা-কাঁপা পা ফেলে লন পেরিয়ে থানাব বারান্দায় উঠলেন অধীরবাবু। জীবনে এই দ্বিতীয়বার। আরেকবার এসেছিলেন, কেবোসিন তেলের হাঙ্গামায়। কম দরে কিনে প্রচুর তেল স্টক করে রেখেছিলেন। তারপর বাজারে তেলের অভাব দেখা দিল। অধীরবাবু সেকেলে ব্যবসায়ী। মাল স্টক করে বেশি লাভে বেচা অন্যায় মনে করেন না। এজন্যেই তো লোকে ব্যবসা করে। আজকাল কী সব আইন যে হচ্ছে দেশে!

সেবারও এমনি করে একতাড়া নোট এনেছিলেন সঙ্গে। কাজ হয়েছিল।

চেনা এক পুলিশ অফিসার অধীরবাবুকে দেখে একগাল হেসে বললেন, আরে আসুন! আসুন। দত্তমশাই আসুন।

কথার সুরে ব্যঙ্গ। অধীরবাবুর কান লাল হয়ে গেল। একেই

বলে পুলিশ। মা বাপকেও ছেড়ে কথা কয় না। সিঙ্গির ভাইপো পুলিশ অফিসার। সিঙ্গির কাছেই ঘুষ খেয়েছিল। শোনা কথা হলেও বিশ্বাসযোগ্য। অধীরবাবু গলা সাফ করে বললেন, ইয়ে, বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই স্যার।

চলে যান না। রামকিষণ! দত্তবাবুকে ও-সি সায়েবের ঘরে নিয়ে যাও।

অধীরবাবু পর্দা তুলে বললেন, আসব স্যার?

মহী দারোগা একমুখ হেসে বললেন, আরে! আসুন, আসুন! ওয়েটিং ফর ইউ! বসুন।

টেবিলের এপাশে মোনা গম্ভীর হয়ে বসে আছে। অধীববাবু ঢুকেই তার কান খামচে গর্জালেন, শেষ করে ফেলব! হতভাগা বাঁদর!

মোনা হাত চেপে ধরে বলল, আঃ!

মহীবাবু হা হা করে হেসে বললেন, আরে মশাই, এখন আর কান টানাটানি করে লাভ কী? বসে পড়ুন। বসে পড়ুন। কথা আছে।

অধীরবাবু একটু তফাতে হাঁফাতে হাঁফাতে বসলেন।—আমার ইজ্জত গেল! এ কী সব্বোনেশের জম্মো দিয়েছিলুম! আমার মাথা কাটা গেল। হায় হায় হায়!

মহীবাবু টেবিলে ঠুকঠুক করে বেটন ঠুকতে ঠুকতে পিতাপুত্রকে দেখে নিয়ে হাঁক দিলেন—রামকিষণ! রামকিষণ এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়াল।

পিলে চমকে উঠল অধীরবাবুর। মোনাকে ধোলাই দেবে নাকি চোখের সামনেই!

মহীবাবু বললেন, তিনকাপ চা নিয়ে এসো। নিন দত্তবাবু, সিগারেট নিন।

অধীরবাবু করযোড়ে বললেন, চলে না স্যার!

তারপর সব চুপচাপ। অস্বস্তিকর নীরবতা। তারপর চা এলো। মহীবাবু বললেন, নিন, চা খান। বাবাজী, নাও!

চা খেতে খেতে মহীবাবু বললেন, মুশকিল কী দত্তবাবু, জানেন? আপনার ছেলেকে এ কেসে বাঁচানো কঠিন। কাল সন্ধ্যাবেলা হরেরাম স্টোর্সে মুখোস কিনেছে আপনার ছেলে—জিজ্ঞেস করুন।

অধীরবাবু কটমট করে তাকালেন মোনার দিকে। মোনার মুখ জানালার দিকে। আস্তে চায়ে চুমুক দিচ্ছে।

মহীবাবু বললেন, তার ওপর সিঙ্গিমশাইয়ের জামাই তো সবই কবুল করে বসে আছে। এখন কথা হচ্ছে, আপনার ছেলের সঙ্গে কালই আমার পরিচয় হয়েছে। আমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পিকনিক করে এলো। কাল সন্ধ্যায় ওকে আমার স্ত্রী চা-ফা খাওয়ালেন। গল্পস্বল্প হল। এই হয়েছে আমার জ্বালা। মানে প্রব্লেম।

অধীরবাবু সায় দিয়ে বললেন, বটেই তো! বটেই তো!

আমি পুলিশে চাকরি করি বলে তো অমানুষ নই মশাই! হা হা করে ফের হাসলেন মহীবাবু।—আরে! আমরাও তো এককালে বাবার পকেট মেরে থিয়েটারের চাঁদা দিয়েছি। তবে কি না, এটা যদি আপনার বাড়িতে ডাকাতির ব্যাপার হত, কথা ছিল না। বাপের ক্যাশ ছেলে লুটবে। সো হোয়াট? কিন্তু সিঙ্গিমশাইকে তো জানেন। ইনফ্লুয়েন্সিয়াল লোক। ওর জামাইকে ধরা হল যখন, তখন এসে মেটাতে চাইছেন। বলছেন, যা হবার হয়েছে, টাকাটা ওর কাছ থেকে বের করে মিটিয়ে দিন মহীবাবু।

অধীরবাবু জিজ্ঞেস করলেন, সিঙ্গি তাই বলছে বুঝি?

হ্যাঁ। কিন্তু বুঝতেই পারছেন, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। কেস যখন হয়ে গেছে, তখন আর উপায় কী? মহীবাবু দুলতে থাকলেন। একটু পরে ফের বললেন, হুঁ, আপনার ছেলেকে বাঁচানোর একটা উপায় হতে পারে। টাকাটা ফেরত দিক। সিঙ্গি বলছে, নগদ

হাজার চারেক ছিল। আপনি ছেলেকে বলুন, টাকাটা কোথায় আছে জানাক। আমি সব ম্যানেজ করে দিচ্ছি।

অধীরবাবু চাপা গলায় মোনার দিকে ঝুঁকে বললেন, কোথায় রেখেছিস?

মোনা গলার ভেতর বলল, কাছেই আছে।

মহীবাবু ঝুঁকে এলেন টেবিলের ওপর।—তোমার সঙ্গে আছে? তোমাকে তো সার্চ করা হয়েছে বাপু! হেঁয়ালি করছ কেন? আর কথা বাড়িও না।

মোনা তাকাল।—শ্রাবন্তীকে রাখতে দিয়েছি।

মহী দারোগার বেটন টেবিলে ঠকাস করে পড়ে গেল। অধীরবাবু গোল চোখে তাকিয়ে রইলেন। তারপর মহীবাবু কী বলতে ঠোঁট ফাঁক করলেন, কিন্তু বললেন না। হাঁ করেই থেকে গেলেন।

মোনা বলল, জিজ্ঞেস করুন না শ্রাবন্তীকে। ও সব জানে। এমন কী, শ্রাবন্তী বলেছিল, দরকার হলে আপনার রিভলবার চুরি করে দেবে। আমি বলেছিলুম, থাক। রিভলবাব আমার বড়দারই আছে।

মাই গুডনেস! মহী দারোগা আঁতকে উঠলেন।—এ যে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা! তারপর হো হো করে হেসে উঠলেন।

মোনা এবার স্মার্ট হয়ে বলল, শ্রাবন্তীই তো প্ল্যানটা দিলে।—বললে, ডাকাতরা কী ভাবে ডাকাতি করে ওর সব জানা। আপনার কাছেই নাকি শুনেছে!

মহী দারোগা বললেন, এই রে! সেবেছে! বুঝলেন দত্তমশাই, ছোটবেলায় বড্ড গপ্পো শুনতে চাইত। চোর-ডাকাত দেখতে পেত, আর উত্যক্ত করে ছাড়ত। কে ওরা? কেন ওরা চুরি-ডাকাতি করে? কিভাবে করে? বুঝলেন? পুলিশ লাইফের এই একটা ভেরি ব্যাড সাইড মশাই। ছোটদের মধ্যে ভেতরে ভেতরে একটা যেন সাইকোলজিক্যাল ব্যাপার ঘটে যায়। যাক্ গে, চলুন তো দেখি।

এখন লজ্জার চড় গাল পেতে নেওয়া ছাড়া উপায় কী? আপনার বরাত আর আমার বরাত দেখছি একই সুতোয় বাঁধা পড়েছে। কী আর করা যাবে? হেঁ হেঁ হেঁ, রগুড়ে ব্যাপার বটে।...

থানার ঘন্টিদার বারো বার ঘণ্টা বাজাল। তখন পুলিশের জীপে অধীরবাবু আর মোনা বাড়ি ফিরছেন। ড্রাইভার মন্তব্য করল, বিনোদ খান্না ভি এইসা কিয়া, মালুম হোতা। কৈ পিকচারমে।

পথে চোখে পড়ল, একটা রিকশোয় সিঙ্গিমশাই যাচ্ছেন। পাশে জামাই ষষ্ঠীচরণ বসে আছে। ফুলো ফুলো মুখ চোখ। মোনার চোখে চোখ পড়তেই কিন্তু ফ্যাঁচ করে হেসে ফেলল।

পিছনে আরেকটা রিক্শোয় হেমবরণীও আছে। হেমবরণীর চোখ দুটো ছলছল করছে। তার পাশে ওদের ঝি বুড়ি তার কাঁধে হাত রেখে কী বোঝাচ্ছে।

জীপ চলে গেল। অধীরবাবু বাড়ি ঢুকে বললেন, বড়বউমা! মেজবউমা! তোমরা এদিকে একবারটি এসো তো! তারপর স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বললেন, কোথা গেলে গো! এই নাও, তোমার সুপুত্তুরটিকে কোলে নিয়ে বসে থাক!

শান্তা দৌড়ে এসে মোনার গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, মারধোর করেনি তো ঠাকুরপো?

মোনা হেসে বলল, ভ্যাট্! মারবে কে? জামাই আদর খেয়ে এলুম। জিজ্ঞেস কর না বাবাকে। তাই না বাবা?

অধীরবাবু ধমক দিলেন, থামো! এবার যেন আর ডুবিও না। তাহলে মহী দারোগা আমাকে বুড়ো বয়সে জেল খাটিয়ে ছাড়বে। বউমারা! একে ঘরে পুরে তালা এঁটে রাখ। পালালে আমাকে দারোগাবাবুর গুঁতো খেতে হবে।

করুণাময়ী কাঁদতে কাঁদতে আলুথালু বেশে বেরিয়ে এলেন।

অধীরবাবু বললেন, মড়াকান্না কেঁদো না। কথা শোন,

মহীবাবুরা ও বেলা আসবেন। নেমন্তন্ন করে এসেছি। ও বেলা সব কথাবার্তা পাকা হবে। দেখি, গদীতে যাই। সব লুঠপাট হয়ে গেল এতক্ষণ।

শান্তা বলল, কি কথাবার্তা বাবা? ও বাবা, বলুন না কিসের কথাবার্তা।

অধীরবাবু দুঃখের হাসি ফুটিয়ে বললেন, আবার কি? শেষ পর্যন্ত রফা একটা করতেই হল। মহীবাবুর মেয়ের সঙ্গে মোনার বিয়ে! কি করি আর? বিয়ে তো দিতেই হবে ছেলেটার।

শান্তা হাততালি দিয়ে বলল, ঠাকুরপোর বিয়ে? শ্রাবন্তীর সঙ্গে? খুব ভালো হবে, দারুণ ভালো হবে। আমি ওদের দেখা অব্দি মনে মনে ঠাকুরের কাছে মাথা কুটেছি, জানেন? শান্তা নাচানাচি জুড়ে দিল শ্বশুর শাশুড়ির সামনে।

মোনা গটগট করে ওপরে চলে গেল। অধীরবাবু বললেন. মহীবাবু বললেন, কলকাতায় দুটো বাড়ি কেনা আছে। একটা ফ্ল্যাটও কিনেছেন মেয়ের নামে গড়িয়াহাটায়। আর…যাক্ গে, একগ্লাস জল দাও। বেরোই।

* * *

এ বিয়েতে গীতা আসেনি। তবে গণারা খুব স্ফূর্তি করেছে।

ষষ্ঠীচরণকেও মোনা নেমন্তন্ন করেছিল। শ্বশুরের ভয়ে সেও আসতে পারেনি। দেখা হলে শুধু দূর থেকে হাত নেড়েছে। মোনা অষ্টমঙ্গলায় শ্বশুরবাড়ি গেল। তারপর বিকেলে বেড়াতে বেরিয়েছে নদীর চরে। শ্রাবন্তী বলল, এই! জানো? এখানে এসে কি বিপদে পড়েছিলুম?

মোনা বলল, শুনেছি। তোমাকে কারা…

ছাই শুনেছ! আমাকে কারা মানেটা কি? শ্রাবন্তী ফুঁসে উঠল, অত সাহস তোমাদের এখানে কারুর নেই। সব জানা আছে!

তবে কি?

তুমি তো ভূত বিশ্বাস কর না। আমি করি। আমাকে ঢিল ছুড়েছিল। অনেকগুলো ঢিল। শ্রাবস্তী ওর গা ঘেঁষে দাঁড়াল।—তারপর তো ভীষণ ভয় পেয়ে দৌড়ে বাসায় গেলুম। বাবা সবে ফিরেছেন। বললেন, কি হল রে? ঢিলের কথা শুনেই বাবার মাথা খারাপ হয়ে গেল। পুলিশ ভূত বিশ্বাস করে না। বাবা বললেন, একদল ছোকরা ওখানে ঘুরে বেড়ায়, দেখেছি। এ নিশ্চয় তাদেরই কাজ, থামো, দেখাচ্ছি মজা! আব ব্যস! তারপর কাদের সব ধরে এনে খামোকা মারধোর করা হল।

মোনা বলল, তোমার বাবা মাইরি পুলিশ না। ফুলিশ!

শাট আপ! বাবাকে ফুলিশ বলো না।

মোনা জিভ কেটে বলল, সরি! আমি পুলিশের জামাই, তা ভুলে যাচ্ছি। যাক্ গে, শোন। গণা বেচারা খামোকা মার খেয়েছিল। ওর মনে প্রচণ্ড দুঃখ আছে। বিয়েতে সাধাসাধি করে তবে এলো। ওর কাছে তুমি একটু ক্ষমা-টমা চেয়ে নিও শ্বশুর-মশাইয়ের হয়ে।

শ্রাবস্তী লক্ষ্মী মেয়ের মতো বলল, শুনে কষ্ট হচ্ছে। আমি তো জানতুম না উনি তোমার বন্ধু।

ধূসর হয়ে এসেছে চারদিক। দুজনে চর থেকে উঠে আসছে। হঠাৎ সামনে একটা ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়াল। এদিকে রাস্তার আলো পৌঁছায় না। শ্রাবস্তী মোনাকে চেপে ধরল। মোনা বলল, কে?

ফ্যাঁচ করে একটা শব্দ হল। তারপর—ভয় পেলেন নাকি? আমি ষষ্ঠী।

তাই বলুন! কি ব্যাপার?

আপনার সঙ্গে কথা আছে।

না মশাই, আর কথা-টথা নেই আপনার সঙ্গে।

আহা শুনুন না। রাস্তা ক্লিয়ার হয়ে এলো বলে। ষষ্ঠীচরণ

চাপা গলায় বলল, আমার শ্বশুরমশাই আজ সকাল থেকে বিছানায় গড়িয়েছেন। দেখে মনে হচ্ছে আর ওঠেন কি না। ফ্যা-ফ্যা-ফ্যাঁচ।

ষষ্ঠীচরণ হাসতে থাকল। মোনা ও শ্রাবন্তী পা বাড়াল। ষষ্ঠীচরণ সঙ্গ ছাড়ল না।—তাই সুখবরটা দিতে এলুম আপনাকে। বই আমরা তুলবই। হিরোইনেরও অসুবিধে নেই। আপনার ঘরেই রয়েছেন। আমাকে কিন্তু সেই সাধুর পার্টটা দেবেন মানসকুমারবাবু।

দেব। আচ্ছা, চলি ষষ্ঠীবাবু!

ষষ্ঠীচরণ বলল, আর মোটে কয়েকটা দিন ধৈর্য ধরুন। শ্বশুর-মশাইকে চিতেয় চাপানো হলেই এক ব্যাগ টাকা নিয়ে হাজির হব। বই করা চাই-ই। তিন লাখ কেন দশ লাখ সই। লোকটার টাকার পাহাড় আছে, জানেন? বিস্তর লোকের রক্ত মশাই! না খেয়ে জমিয়েছে সারাজীবন। কত লোককে বঞ্চনা করেছে, ফাঁকি দিয়েছে। চোখের জলে ভাসিয়েছে।…

বাকি কথাগুলো বাতাসের শব্দে শুনতে পেল না মোনা। যেতে যেতে ঘুরে দেখল, ল্যাম্পপোস্টের আলোয় ষষ্ঠীচরণের চোখ দুটো জ্বলছে। একটু অবাক লাগল এতদিনে। গরীব ঘরের ছেলে ষষ্ঠীচরণের মুখে-চোখে যেন প্রতিহিংসা জ্বলজ্বল করছে।

মোনা শ্রাবন্তীর একটা বাহু নিয়ে বলল, পাগল! পাগল!

থানা কোয়ার্টারের গেটে ঢোকার মুখে ফের একবার মোনা ঘুরল। তখনও রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে ষষ্ঠীচরণ। সিগারেট ধরাচ্ছে। বেঢপ শার্ট পাতলুন পরা মূর্তি। এতক্ষণে মোনা চমকে উঠে ভাবল, যেন তার নিজের মধ্যেও অমনি একটা ষষ্ঠীচরণ দাঁড়িয়ে আছে।

———

সীমানা পেরিয়ে

পূজোর আগে চণ্ডীতলা বর্ডার ক্যাম্পের সেপাই দাতোয়ার সিং ফরাক্কার ওদিকে বদলী হয়ে যায়। সেই সময় বিরাংকে সে এক জোড়া বুটজুতো বেচেছিল। দরাদরি করে পাঁচ টাকায় রফা।

জুতো জুটো সেপাইজীর পায়ের নয়, বিরাং আঁচ করেছিল। ওর চেয়ে বিরাং অনেকটা লম্বা চওড়া মানুষ। বয়স ষাট পেরিয়ে গেলেও শক্তসমর্থ। দাতোয়ার সিং তার ছেলের বয়সী।

কিন্তু খুঁটিয়ে জিগ্যেস করতে চায় নি বিরাং, এ জুতো বাড়তি হল কীভাবে—কিংবা কার পায়ের জুতো। পুরনো তো নয়ই, বরং কেউ পায়ে দিয়েছে কিনা সন্দেহ। প্রায় আনকোরা নিখুঁত জিনিস। তার মতো রাতচরা মানুষের পক্ষে খুব কাজের হবে বলেই কিনতে রাজী হয়েছিল।

তবে মনে একটা ধোকা থেকে গিয়েছিল। জুতোজোড়া পরে দিনকতক পায়ের খোয়ারও কম হয় নি। লোকে হাসাহাসি করত। এমন কী তার মেয়ে জবাও ঠাট্টাতামাসা করতে ছাড়ত না। বিরাং গ্রাহ্য করেনি। শুধু মাঝে মাঝে কেমন খটকা লাগত, এ জুতো সেপাইজী পেল কোথায়?"

পরে একদিন শহরে পাটোয়ারীজীর গদীতে যায় বিরাং। মণি সিং পাটোয়ারী এই পদ্মাসীমান্তে এক বড় কারবারী। ওদিকে ফারাক্কা, এদিকে লালগোলা ছাড়িয়ে পদ্মার কিনারা বরাবর সেই সুপারিগোলার হাট অব্দি তাঁর নাম আছে।

পাটোয়ারীজীই প্রথম তাকে জানান, এ জুতো পদ্মার ওপারের মিলিটারীরা পরে। পুরু রবার সোলের গায়ে সেটা নাকি লেখাও আছে। তারপর পাটোয়ারীজী তাকে ঠাট্টার ছলে বলেন, ও বিরাং, এ নিশ্চয় পদ্মার চরে কোন মড়ার ঠ্যাঙ টানাটানি করে বাগিয়ে এনেছিল দাতোয়ার। ওকে তো আমি ভালই চিনি।

দাতোয়ার সিং বদলী হয়ে গেছে। চণ্ডীতলা ক্যাম্পে সে থাকলে

বরং সোজাসুজি জিগ্যেস করা যেত। বিরাং একটু শিউরে উঠেছিল। সে জানে রক্তটক্ত এখনও লেগে আছে নাকি। দিব্যি পায়ে দিয়ে কত ঘোরাঘুরি করে বেড়াল। তার চেয়ে সাংঘাতিক কথা, সে কি তাহলে একজন মরা মানুষের জুতো পরে বেড়িয়েছে এতদিন? মনের ধোকাটা, দেখা যাচ্ছে, অকারণ ছিল না।

সেদিন সে জুতো দুটোকে রগড়ে ধুয়েছিল। তারপর পালিশ চড়িয়ে নিয়েছিল রাস্তার ধারে এক মুচির কাছে। মুচি যখন পালিশ চড়াচ্ছে, তখন তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছিল বিরাং—কিছু বলে নাকি। জুতো নিয়েই এদের কারবার। জুতোর ব্যাপার ওরা ভাল জানে।

কিন্তু লোকটা সে ব্যাপারে মুখই খুলল না। শুধু বলল, চার আনা।

বিরাং জেদী মানুষ। জুতো পরে পাঁচ মাইল জলজঙ্গল ঠেঙিয়ে গাঁয়ে ফিরেছিল। নির্জন মাঠে উলুকাশের জঙ্গলে সন্ধ্যার মুখোমুখি শুধু আচমকা চমক খেয়েছিল, যেন সে নয়, জুতোর আসল মালিক থপথপ করে হেঁটে চলেছে।

এই বিদঘুটে অনুভূতি তার পরেও কখনও কখনও তাকে পেয়ে বসেছে। হঠাৎ মনে হয়েছে, দয়াল খামরুর ছেলে বিরাম খামরু নয়, সে যেন এক অচেনা মানুষ হয়ে হেঁটে যাচ্ছে। এই শরীরে অন্য কেউ ভর করেছে ভাবলে নির্জন নিশুতি রাতে কী এক আতঙ্ক তাড়া করে। বিরাং দিনে দিনে কেমন আনমনা হয়ে যাচ্ছিল।

পদ্মার চরে মাঝে মাঝে লাস পড়ে না, এমন নয়। গত গ্রীষ্মে সাধুখাঁর দিয়াড় নামে একটা চরে দু'পারের বর্ডার মিলিশিয়ায় আচমকা লড়াই বেধেছিল। বিরাং সে রাতে দিয়াড়ের কাছাকাছি একটা জেলেবস্তীতে ছিল পাটোয়ারীজীর কাজে। তখনই গুলির শব্দ শোনে। সে জানে, বখরা নিয়েও মাঝে মাঝে ঝামেলা বাধে। গুলি চলে। কিছুদিন বর্ডার ছম ছম করে স্তব্ধতা আর চাপা উত্তেজনায়। পুলিশবাহিনী আসে। সরকারী কর্তারা আসেন।

কখনও দলে দলে মিলিটারীও এসে যায়। তারপর দুদেশের অফিসারবা পদ্মার কোনও চরে দাঁড়িয়ে মীমাংসা করে ফেলেন। তখন আবার শান্তি ফেরে সীমান্তে।

বিরাং জেদ করেই জুতোজোড়া পরে। কিন্তু সাধুখাঁর দিয়াড়ের ঘটনাটা মন থেকে যায় নি। চণ্ডীতলা ক্যাম্পের সেপাই দাতোয়ার সিংকে নিয়ে একটা গুজব উঠেছিল। তাকে নাকি ওপারে ধরে নিয়ে গেছে। পরে দেখা গেল, গুজব, স্রেফ মিথ্যে। দাতোয়ার দলছাড়া হয়ে পড়েছিল। রাস্তা ভুলে কোথায় কোথায় ঘুরে পরদিন দুপুর নাগাদ ক্যাম্পে ফিরে আসে। শোনা যায়, তার হাতে একটা মস্ত মোরগও ছিল।

তাহলে বোঝা যায়, পাটোয়ারীজীর কথায় ভিত্তি আছে। ওপারের কোনও সেপাই পায়ের জুতো খুলে নিশ্চয় নাক ডাকাতে আসেনি পদ্মার চরে। তার লাস থেকে যে-সব জিনিস উদ্ধার করা হয়েছিল, তার মধ্যে দাতোয়ারীর ভাগে এই বুটজোড়াটা পড়েছিল, তাহলে।

কথাটা বিরাং মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করেছে। পারে নি। তাব চেয়ে বড় কথা, নিজের ভয় ভাঙাতে জেদ করেই ও জুতো পরেছে এবং ক্রমশ তার যেন নেশাও ধরে গেছে।

শীত এলে সে আবার টের পেল, এ জিনিস তার পক্ষে কত জরুরী ছিল। এ অঞ্চলে শীতের দাপট প্রচণ্ড। কনকনে ঠাণ্ডায় জন্তু-জানোয়ারগুলোও চলাফেরা করতে চায় না। ঘাড় গোঁজ করে বসে বা দাঁড়িয়ে থাকে। গুঁতো খেয়ে নড়ে না। দিয়াড় বা উঁচু মাটির বসতিগুলোতে রাতের দিকে কাছে ও দূরে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। পাটকাঠির অভাব নেই। শুতে যাবার আগে লোকেরা শরীর গরম করে নিচ্ছে। বুড়োবুড়িরা দুপায়ের ফাঁকে তুষ বা ভূষির আগুনের গামলা রেখে বসে আছে। এক ক্যাম্প থেকে আরেক ক্যাম্প অব্দি রাতের টহলদারীতে বেরিয়ে সেপাইরা ডিউটি ফাঁকি দেবার তালেই আছে। এ হাড়কাঁপানো শীতে বর্ডার পেরিয়ে মানুষ

যাচ্ছে, বা মাল যাচ্ছে, তার নজরদারীতে আলসেমি স্বাভাবিক।

এইসব সময়েই বিরাংয়ের মহা সুযোগ। জনাই পাটনীর নৌকোয় সে রাতে তুলে দিয়ে এসেছে এক ঝাঁক মানুষ। স্ত্রীলোক আর কাচ্চাবাচ্চাও আছে। পইপই করে বলে দিয়েছে, বাচ্চাগুলো যেন কান্নাকাটি করে না। জনার সঙ্গী আছে দুজন। হাতেম আর মঙ্গল। খুব ডানপিটে ওরা। ওপারে পৌঁছে দিয়ে ভোরের আগে ফিরে আসবে।

বিরাং ফেরার পথে একবার যদু মোড়লের বাড়ি ঘুরে আসে বাইরের ঘরের বারান্দায় তক্তাপোষ আছে। তার ওপর কম্বল বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। জনা পাঁচ সেপাই হ্যারিকেনের আলোয় তাস পিটছে হাতে চায়ের গেলাস। মোড়লের ছেলে কানুও বসে আছে।

খানিক পরে ওখানেই গড়িয়ে পড়বে ওরা। সকালে বিরাংয়ের সঙ্গে দেখা করে যাবে।

বিরাং একটু দূর থেকে দেখেই কেটে পড়ল। জুতোজোড়ার এই মজা। ইচ্ছে করলে নিঃশব্দে হাঁটা যায়।

জবা এখনও জেগে আছে। বলল, ও বাবা! ওঘরের অবস্থা দেখে এসো।

বিরাং বলে, কী রে?

দেখ গে না! আমি সাফ করতে পারব না বলে দিচ্ছি।

নোংরা করেছে নাকি?…বলে টর্চ জ্বেলে বিরাং উঠোনের অন্যপাশে গোয়ালঘরের দিকে পা বাড়ায়। ওটা নামেই গোয়ালঘর। এক সময় কয়েকটা গরু ছিল। কোন চরে চরতে গিয়ে লোপাট হয়ে গেছে। রাখাল ছোঁড়াটা কাঁদতে কাঁদতে এসে বলেছিল, ধরে নিয়ে গেল ওপারওয়ালারা।

ধরে নিয়ে গেল ব্যাপারটা কী, এ তল্লাটে সবাই জানে। সেবার গাঁয়ের আরও অনেকের গরু গিয়েছিল। এর বিরুদ্ধে কিছু করার নেই। কবে সেই থেকে পদ্মার চরের দিকে গরুর পাল নিয়ে যাওয়া গেরস্থের বারণ আছে।

বিরাং আর গরু পোষে নি। দেখাশোনা করারও অসুবিধে। কিন্তু গোয়ালঘরটা রয়ে গেছে। এখন 'কুটুম্ব'রা এসে ওঘরেই থাকে। ঝুলকালিতে ভর্তি চাল, মেঝেও উঁচু-নীচু, তার ওপর তালাই বিছিয়ে দেয়। দরজার মুখে আগের মতই চট আর পাটকাঠির তৈরী পর্দা টাঙানো আছে। ওটা বিনা পাসপোর্ট ভিসায় যারা এপার-ওপার করে তাদের গোপন আশ্রয়স্থল। তারাই 'কুটুম্ব'।

চণ্ডীতলায় বিরাংয়ের মতো 'কুটুম্বে'র কারবার আরও অনেকের আছে। এর মূল ঘাঁটি সেই শহরে পাটোয়ারীজীর গদী।

বিরাং পর্দাটা তুলে আলো ফেলে দেখে নিল। বাচ্চাগুলো পায়খানা করেছে। এ এক সমস্যা। উঠোনে এসে বলল, ঘেঁটুর মাকে বলে আসিস সকালে। সাফ করে দিয়ে যাবে। তুই খেয়েছিস?

জবা মাথা দোলায়।

খাসনি কেন? বিরাং ধমকের সুরে বলে। তোকে নিয়ে আর পারা যায় না। এখনই যদি না ফিরতাম।

জবা সেটা জানে। কখনও বিরাংয়ের ফিরতে ভোর হয়ে যায়। রাতের এই গোপন কারবারে কত ঝুঁকি, জবা তাও বোঝে। একবার বিরাং একরাত একদিন বেপাত্তা ছিল। ফিরে এসে বলেছিল, ওপারে গিয়ে গণ্ডগোলে পড়েছিলাম। জবার সে এক সাংঘাতিক সময় গেছে।

দরকার হলে বিরাংকে ওপারে সেই গোদাগাড়িঘাট অব্দি যেতে হয়। সেখানে তার বন্ধুজন আছে। তারা একই পথের পথিক। বিরাংয়ের ভারি অবাক লাগে। ছেলেবেলায় কতবার বাবার সঙ্গে লালগোলা থেকে স্টিমারে চেপে গোদাগাড়িঘাটে গেছে। আজ তিরিশ বছর সেই স্টিমার চলাচল বন্ধ। রাতে বিছানায় শুয়ে স্টিমারের ভোঁ শুনতে কী ভাল না লাগত। জবা ভাবতেও পারে না, চণ্ডীতলার পাশ দিয়ে স্টিমার যেত।

উঁচু দাওয়ার যে দিকটা ঘেরা, সেখানে বসে বাবা-মেয়ে মুখোমুখি ভাত খায়। আজ দুবেলা ইলিশের ঝোল। পদ্মায় ইলিশ উঠছে

প্রচুর'। চণ্ডীতলার পশ্চিমে মজা খালের ওপর দুদেশের যুদ্ধের বছর মিলিটারীরা একটা সাঁকো বানিয়েছিল কাঠের। তার ওপাশে বর্ডার ক্যাম্প আর ছোট্ট একটা বাজার হয়েছে। মাটির উঁচু বাঁধ দিয়ে ধুলো উড়িয়ে ট্রাক আসে শীতকালে। বর্ষায় তো সেটা অসম্ভব। ট্রাকে মাছ নিয়ে যায় শহরের ব্যাপারীরা। রোজ সকালবেলা বাজারে মাছের ভিড়। দূর-দূর জায়গা থেকে অনেকে তাজা ইলিশের গন্ধ পেয়ে সাইকেলে ছুটে আসছে। বিরাং একটা ইলিশ কিনেছিল। কিলো দেড়েকের কম নয়। অত খাবে কে? আদ্ধেকের বেশিটাই কুটুম্বদের দিয়েছিল। ওই গোয়ালঘরের মধ্যেই কেরোসিন কুকারে ওরা রান্না করে খেয়েছে। কুকারটা বুদ্ধি করে বিরাং কিনে রেখেছে। ওঘরে রান্নাবান্নার পক্ষে খুব সুবিধে। বাইরে থেকে টের পাওয়া যাবে না। মশলাপাতি অবশ্য জবাকে বেটে দিতে হয়েছে। বরাবর তারই যত ঝামেলা।

টাকার খাতিরে এসব ঝামেলা বিরাংকে নিতে হয়। আহা, ওরা মানুষ তো বটে। পেট ফেলে রেখে আসেনি। কখনও বর্ডার পার করে দিতে সময় লাগে। দুটো তিনটে দিনও অপেক্ষা করতে হয়। ওপার থেকে খবর না এলে লোক চালান দেওয়া নিরাপদ নয়। যার ধৈর্য আছে, কিংবা জরুরী দরকার—না গেলেই নয়, তাকে বিরাংয়ের কুটুম্ব হয়ে হাপিত্যেশ করা ছাড়া উপায় নেই। একবার সাতদিন ওই ঘরে কাটিয়ে একটা লোক প্রায় কাঁদতে কাঁদতে ফিরে যায়। বিরাং তাকে চালান করতে পারে নি। বর্ডারে গণ্ডগোল চলছিল। সেই বখরা ফাঁকির ঝগড়া।

জবা বলল, বউটা দেখলে? নতুন বিয়ে হয়েছে। ওপারে বিয়ে দিল কেন বাবা?

বিরাং একটু হাসে। হয়তো এপারে বর পায় নি।

আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। জানো বাবা, লেখাপড়া জানে। বি-এ পাস বলল।

বিরাং অল্পস্বল্প চেনে পরিবারটিকে। পাটোয়ারীজীর গদীতে

বুড়ো কর্তাটিকে দেখেছে অনেকবার। শহরেই বাড়ি। ওকালতী করেন। 'ছেলেরা নাকি সবাই ওপারে চাকরি-বাকরি করছে। তারাই উদ্যোগী হয়ে বিয়ে দিয়েছে। তারা বাড়ি বেচে বাবাকেও যেতে বলে। উকিলবুড়ো বলেছে, ধুর ধুব! এখানেই জন্মেছি। এখানেই মরতে চাই। আমাকে টানাটানি কেন বাবু? তোরা সুখে আছিস, থাক।

বিরাং খেতে-খেতে এসব বৃত্তান্ত মেয়েকে শোনায়। জবা সাগ্রহে শোনে। বি-এ পাসকরা মুসলমান মেয়ে এযাবৎ সে দেখেনি। তেমন হিন্দু মেয়েও কি দেখেছে? মনে পড়ে না। শৈশব থেকে কৈশোর কাটিয়ে এসেছে মাসির বাড়ি বিনোদীঘি গাঁয়ে। সেখানে ভদ্রলোক আর শিক্ষিত কিছু পরিবার আছে বটে। শিক্ষিত মেয়েও দেখেছে। তবে তাদের কেউ বি-এ পাস ছিল কিনা জানে না।

জবা ভাবে, এতদিন মাসির ওখানে থাকলে সেও হয়তো বি-এ পাস করে ফেলত। ক্লাস ফোরে ওঠার পরই বাবা তাকে নিয়ে এল। বিয়ে দেবার তর সইছিল না বাবার। তারপর···

জবা আনমনা হয়ে গেল।

বিরাং বলল, যে বউটির দুটো বাচ্চা—সে কে রে? জিগ্যেস করেছিলি নাকি?

জবা বলল, উঁ?

ওই যে বাচ্চা দুটো যাব··

হ্যাঁ। বলল,···কী যেন বলল, বউদি না কী···

বিরাং টের পায়, মেয়ে অন্য কথা ভাবছে। একটু খেয়ালী স্বভাব আছে। বিরাং উঠে পড়ে। কনকনে ঠাণ্ডা জলে কোনমতে আঁচায় বারান্দার ধারে বসে। তারপর পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে। কুটুম্বদের উপহার। সিগারেট ধরিয়ে সে ঘরে ঢোকে। তক্তাপোষে বিছানা হিম হয়ে আছে। লেপ তুলে কোমরঅব্দি ঢাকা দিয়ে সে সিগারেট টানে এবং কাশে। আসলে হয়তো তার বড়লোকী সয় না।

জবা বাইরে থেকে বলে, ও বাবা! তোমার জুতো পড়ে থাকল যে! কুকুরে নিয়ে পালাক!

হ্যাঁ, জুতো। বিরাং তড়াক করে লাফ দিয়ে ওঠে। জুতোর কথা ভুলেই গেছে। সে পা বাড়াবার আগে জবা বাঁ হাতে জুতোজোড়া এনে তক্তাপোষের তলায় রাখল। এখনও আঁচায় নি। ডান হাত সাবধানে তুলে রেখেছে।

বিরাং চুপচাপ সিগারেট টানে। মাঝে মাঝে কাশে। বাইরে শীতের হিম রাত অন্ধকারে থমথম করছে। নিঃঝুম হয়ে গেছে গ্রাম। এক সময় সে কাশির চোটে অস্থির হয়ে সিগারেটটা ফেলে দেয়। বাইরে জবার কাজ শেষ। পাশের ঘরে দরজা বন্ধ করার শব্দ হয়।

আরও কিছুক্ষণ বসে থাকার পব বিবাং উঠে গিয়ে দরজা আটকায়। বিছানায় শুয়ে কুটুম্বদের কথা ভাবে। বেচারারা এই প্রচণ্ড হিম রাতে পদ্মার জলে ভেসে চলেছে। কী অবস্থা হবে, কে জানে!

আগে এসব নিয়ে তার মাথাব্যথা ছিল না। মনটা বরাবর শক্ত ছিল। টাকা নিয়েই নির্বিকার থাকত। আজকাল বুড়ো হয়েছে বলেই যেন মনটা নরম হয়ে গেছে। 'কুটুম্ব'দের কথা সে ভাবে। তাদের সুখসুবিধা, আপদবিপদের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখে।

এতক্ষণ ওরা হয়তো সাধুখাঁর দিয়াড় ছাড়িয়ে পীরের চরের কাছাকাছি হয়েছে। পীরের চর ছাড়ালেই অথৈ জলের দেশ।...

বিরামকে ছেলেবেলা থেকে সবাই বিরাং নামে চেনে। এ নামেই সে বড়ো হয়ে গেল। তার বাবা দয়াল খামরুর অনেক জোতজমা ছিল। খামরু পদবীতে বোঝা যায়, প্রচুর ক্ষেতখামারের মালিক ছিল ওর পূর্বপুরুষরা। দয়ালের আমল অব্দি পদ্মা অনেকটা খেয়ে ফেলেছিল। যতটা ছিল ততটা যদি দয়াল রেখে যেতে পারত, বিরাং দুধেভাতে থাকত। কিন্তু বিরাংয়ের বরাত।

দয়াল জুয়াড়ীদের পাল্লায় পড়েছিল। সে আমলেও এখনকার

মতো পাট ওঠার সুখী মরশুমে এখানে ওখানে মেলা বসত।' সে-সব মেলার উদ্যোক্তাও ছিল জুয়াড়ীরা। ঝুমুর দল আসত দূর রাঢ় অঞ্চলের নানা জায়গা থেকে। তারা আসলে ছিল বেশ্যা মেয়ে। অঙ্গভঙ্গী করে নেচে কুৎসিত গান গাইত। লোকেরা নির্লজ্জ হয়ে পেলা ধরত। তারপর আর যা সব হত, এখন তা বুড়োহাবড়াদের রঙীন স্মৃতি—মনে পড়লে কেউ রোমাঞ্চিত হয়, আবার কেউ হয়তো পাপবোধে কষ্টও পায়। দয়াল সে নেশাতেও মজেছিল। কয়েক বছরের মধ্যে জুয়া, ঝুমুর আর মদ তাকে ছিবড়ে করে ফেলে। জমিজমা শেষ হয়ে যায়। ফতুর দয়াল রোগে ভুগে মারা পড়ে। বিরাং তখন বছর দশেকের ছেলে।

বিরাং বেঁচে থাকার জন্যে কত কী করেছে, এখন আর গুছিয়ে বলতে পারবে না। কত জায়গায় ঘুরেছে পেটের ধান্দায়। যৌবনে সে ভৈরব নদীর ঘাটে পাটনীগিরি করেছিল। ইলমপুরের ঘাটে সে ঘরও বানিয়েছিল। বউ জুটিয়েছিল। মণি সিং পাটোয়ারীর বাবা তখনও বেঁচে। তিনিই নানা জায়গায় ঘাট ডাকতেন। কালেক্টরীতে ফিবছর ঘাটের ডাক নীলামে উঠত। ডেকে নিতেন। ইলমপুরের ঘাট ছিল তাঁরই। যুদ্ধের বছর খেয়ানৌকোর ভাড়া বেড়ে এক আনা অব্দি হয়েছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও বছর তিনেক বিরাং ওই ঘাটে নৌকো বেয়েছে।

একবার হঠাৎ কী খেয়ালে সে পনের মাইল হেঁটে চণ্ডীতলায় বাবার ভিটে দেখতে এল। এসেই হাওয়ায় টাকার গন্ধ পেল। সবে পাশপোর্ট ভিসার ব্যবস্থা চালু হয়েছে। এতে লোকেরা পড়েছে ঝকমারিতে। জেলার সদরে ছোটাছুটি, হাপিত্যেশ, কাগজকলমের ঝামেলা কেউ পোহাতে চায় না। তাছাড়া পুরুষানুক্রমে যাদের ব্যবসা-বাণিজ্য আছে, তারাও পড়েছে মুশকিলে।

বিরাংয়ের পক্ষে রাতবিরেতে নৌকো বেয়ে লোক কিংবা মাল পদ্মাপার করে দেওয়া এমন কিছু কঠিন ছিল না। চণ্ডীতলার কেউ কেউ তখন একাজে পোক্ত হয়ে উঠেছে। অবস্থা ফিরে যাচ্ছে

তাদের। এলাকা জুড়ে সবাই টের পেয়ে গেছে, বর্ডারে টাকার ঝাঁক উড়ে বেড়াচ্ছে রাতের অন্ধকারে। যে যতটা পারছে, কুড়োচ্ছে।

বিরাং কাজে ইস্তফা দিয়ে ফিরে এসেছিল চণ্ডীতলায়। তারপর থেকে সে সুখের মুখ দেখেছে। অন্তত ইঁটের একটা ঘর তুলতে পেরেছে। উঠোনে কুয়ো দিয়েছে। দুবেলা পেটের ভাতটা আর পরণের কাপড়চোপড় দিব্যি জুটে গেছে।

কিন্তু এ ভারি বিপদের কাজ। সময়ে সময়ে প্রাণ বাঁচানো সমস্যা হয়ে পড়ে। কতবার গুলি খেতে খেতে একটুর জন্যে বেঁচে গেছে। এখন ভাবলে তার অবাক লাগে। অবশ্য সে প্রায় সারা জীবন জলচরা মানুষ। অনেক খোয়ারে শরীরটা গড়েপিটে এমন শক্তসমর্থ করে তুলেছিল। সহজে ভয় পেত না। ঘাবড়েও যেত না।

প্রথম কয়েকটা বছর নানা হাঙ্গামা গেছে। বর্ডার পুলিশ তো বটেই, কালীতলা থানার দারোগাবাবুরাও তাকে বিস্তর হেনস্তা করেছিলেন। পরে টের পেল, বড় পাটোয়ারীজীর ছেলে মণি সিং গদীতে বসেছেন এবং এপার-ওপার চালানী কারবার চালিয়ে যাচ্ছেন। আগের পরিচয়ের সুবাদে বিরাং তাঁর কাছে হাজির হয়েছিল। তারপর থেকে আর হাঙ্গামা পোহাতে হয়নি। পুলিশ বা বর্ডার মিলিশিয়ার সবাই জেনে গেছে, বিরাং খামরু পাটোয়ারীজীর লোক। তার গায়ে হাত দেওয়া যাবে না।

আজ বছর দশেক হলো, নিজে নৌকো বাওয়া ছেড়েছে বিরাং। আর তাকে কেউ মাঝি বা পাটনী বলে না। তার চেহারায় জলের ধোপে ক্ষয়াটে ভাবটা আর নেই। মোটামুটি চলনসই ভদ্র পোষাক পরে সে ঘোরে। সিগারেটও কেনে কদাচিৎ। ক্যাম্পের ওখানে ছোট্ট বাজারে পূর্ণিয়ার নাপিত ঝব্বুর কাছে দাড়ি কামিয়ে আসে নিয়মিত। কিন্তু সে বিলাসী হয়ে ওঠেনি। এ বয়সে আর যৌবনের সাধ আহ্লাদ উসুল করার ইচ্ছে নেই।

এলাকার চাষীদের অল্পস্বল্প দাদন দেয় বিরাং। পাট কিংবা রবিখন্দের ওপর। মালটা পাটোয়ারীজীর ট্রাক এসে নিয়ে যায়।

খরার পর মাস চারেক বাঁধে ভারি গাড়ি চলাচল নিষেধ। বিরাংয়ের সাধ যায়, পাটোয়ারীজীর মত একটা ট্রাক কিনবে। নতুন ট্রাক কেনা তার সাধ্যের বাইরে। পুরনো পেলেই বা ক্ষতি কি? এ তার মনের কথা। মুখ ফুটে মেয়েকেও বলতে বাধে। তার বড় সাধ, হারানো সেই খামরু-সংসার আবার ফিরিয়ে আনে। অথচ যেন বয়সের চাপে কেমন আলসেমি চেপে ধরেছে।

দাদনের কারবারটা তার একটা চমৎকার আড়াল হয়েছে। পুলিশ বা সরকারী কর্তারা যে চেপে ধরবে, তার যো নেই। বিরাং খামরু পাটোয়ারীজীর কাছে এ বিদ্যে রপ্ত করেছে। যদি নিশুতি রাতে কোথাও পুলিশের কর্তাব্যক্তিদের সামনে পড়ে যায়, কৈফিয়ৎ খুব লাগসই। আদায়ে গিয়েছিলাম, ফিরতে রাত হয়ে গেল। চাষীরা কি সহজে দাদন উসুল করতে চায় স্যার? বুঝতেই পারছেন।

বর্ডার জুড়ে জলজঙ্গলে ভরা এই বিশাল এলাকায় অজস্র বসতি। বর্ডার হয়েছে বলে তারা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারবে না, সে কথা আইনে লেখা নেই। অবশ্য অশান্তির সময়ের কথা আলাদা। তখন তো কারফিউ জারি থাকে।

সেও কাগজে কলমে বড় জোর। কারফিউ মানছে কিনা, এমন এলাকায় সেটা লক্ষ্য রাখা কঠিন। চোরাচালানী কারবার সামান্য থমকায় মাত্র। তারপর ঠিক নিজের তালে চলে। মানুষজনও দিব্যি এপার-ওপার করে। বিরাং খামরু পাঁচ ব্যাটারির লম্বা টর্চ নিয়ে পদ্মার ধার ঘুরে আসতে ছাড়ে না। নির্জন অন্ধকার রাতে কোথাও বালিয়াড়ির ওপর নিশ্চিন্তে বসে সে জলের শব্দ শোনে। এ এক ভাষা। সে ভাষা সে বোঝে। সারা জীবন সে নদীর সঙ্গে আপন মনে কথা বলেছে। কথা শুনেছে।

দূরে কুয়াশাভরা অন্ধকারে একবার আলো জ্বলে এদিক ওদিক নড়াচড়া করে নিভে যায়। জনাইরা ফিরছে। আশ্বস্ত হয় বিরাং।

পদ্মা খামরুদের যা সব খেয়েছিল, প্রায় তিরিশ বছর ধরে একটু একটু করে তার দাম বাবদ টাকাকড়ি ফিরিয়ে দিচ্ছে। হাত পেতে

নেবে না তো কি ফেলে দেবে? বিরাং জানে, সে মহাপুরুষ নয়। আর লোকে বর্ডারের নামে আফশোস করে। দেশভাগ নিয়ে কাঁইকুঁই করে। বিরাং জানে, তার মত কতজনের কাছে এ এক শাপে বর। নীতিকথা বিরাং আজকাল বোঝে না। সব কারবারের মত এ এক কারবার ছাড়া কী?

ভোর রাতে জনাইবা ফিরে এসেছিল। ঘন কুয়াশার মধ্যেও চিনে আসতে ভুল করে না ওরা। টাকাকড়ি বুঝে নিয়ে চলে গেল।

হাতেম একটা বোঁচকা এনেছিল। সেটা রেখে গেছে। সুযোগমতো নিয়ে যাবে পরে। সকালে জবা সেটা দেখে বলল, ও বাবা! এটা আবার কী?

বিরাং বাজারের দিকে বেরুচ্ছিল। বলল, কাপড়চোপড় হবে।

কী কাপড় বাবা!

ওসব ফরেং কাপড়। হাতেম এনেছে ওপার থেকে।

ফরেং বা ফরেনমেড কাপড়ের কথা জবা জানে। সারা তল্লাটে এসব কাপড় অনেকেই পরছে-টরছে। জবা বলল, এর মধ্যে সোয়েটার নেই বাবা?

বিরাং বিরক্ত হয়ে বলল, আমি কী জানি? তোর সোয়েটারের অভাব নাকি?

জবা রাগ করে কুয়োতলায় গিয়ে দাঁড়াল। বিরাং বেরিয়ে যায়। সকালের দিকে বাজারে গিয়ে কিছুক্ষণ না কাটালে চলে না। কাজ আর আড্ডা দুই-ই হয়। ওখানেই মানুষপাচারের দালালদের আনাগোনা। বিরাং আড়কাঠি হয়ে বসে থাকে। দালালরা দু'তিন টাকা পেলেই সন্তুষ্ট মাথাপিছু।

আগে জমিদারের কাছারিঘর ছিল। সেটাই এখন বর্ডার মিলিশিয়ার ক্যাম্প। সামনে একটা বটগাছের গোড়ায় ভাঙাচোরা সিঁদুরমাখানো একখানা পাথর আছে। ওই চণ্ডীর থান। সেপাইরা মন্দির বানিয়ে দেবীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে। চাঁদা উঠতে শুরু করেছে।

বিরাংকে একশো টাকা ধরেছিল, সে পঞ্চাশের বেশী দেয়নি। বর্ডারে প্রচুর টাকা। মন্দিরটা ভালভাবে হবে, তাতে সন্দেহ নেই।

রোববার বুধবার হাটও বসে। কয়েকটা আটচালা আছে। এই হাট দেশভাগের পর হয়েছে। কালীতলায় নন্দীবাবুরা বসিয়েছিলেন। অন্য অন্যদিন সেখানে রাজ্যের কুকুর আর ভিখিরীরা এসে আড্ডা দেয়। বিরাং জানে, ভিখিরীরাও বাগে পেলে দু'পয়সা কামাতে ছাড়ে না। ওরা মুখ দেখেই বুঝতে পারে কে ওপার থেকে এসেছে। ব্ল্যাকমেল করে দু'পাঁচ টাকা আদায় করে ফেলে।

বিরাং তেতো হয়ে ভাবে, এ শালা এক ভাগাড় হয়ে উঠেছে যেন। রাজ্যের শকুন এসে জুটছে ক্রমশ।

মহীর চায়ের দোকানে ভিড় জমেছে। কাঠের সাঁকো পেরিয়ে যেতে যেতে বিরাং মোরগের ডাক আর হাসির হল্লা শুনতে পেল।

আবার কে! শচী হরবোলা এসেছে। শচীর বাড়ি ইলমপুরের ওদিকে কী গাঁয়ে। ও নাকি বড় ঘরের ছেলে। কপালদোষে বিরাংয়ের মত নানা ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিরাং তাকে স্নেহআতিথ্য করে। চণ্ডীতলায় এলেই তার বাড়িতে দু'একটা দিন কাটিয়ে যায় শচী। সে-আসা হরবোলাগিরি করতে নয়, জানাশোনা লোক পাচারের মতলবে। তবে বিরাং জানে, শচী দালাল নয়। বিরাংয়ের সঙ্গে চেনাজানা আছে বলেই তার সাহায্য নিতে আসে। বিরাংও তার খাতিরে পয়সাকড়ি কম করে নেয়।

শচী তাকে দেখে উঠে দাঁড়ায়। জোকারের ভঙ্গীতে নমস্কার করে বলে, খামরু জ্যাঠা! গুড মর্ণিং!

বিরাং হাসে। বাবাজীবন, সকালবেলা কোত্থেকে এসে জুটলে গো?

বহরমপুরে ছিলুম জ্যাঠা। শচী আসর ভেঙে উঠে এল কাছে। হঠাৎ কী খেয়াল হল, রাত বারোটার আপে লালগোলা চলে এলুম। বাকি রাত প্ল্যাটফর্মে কম্বল মুড়ি দিয়ে কাটিয়েছি। তারপর ভোরবেলা মনোহরদার ট্রাকে এসে পড়েছি। আপনি ভাল আছেন তো খামরু জ্যাঠা?

বিরাং চোখের ইশারায় জানতে চাইল, লোকচালানী ব্যাপার কিছু আছে নাকি।

শচী বুঝতে পেরে হাসল। জনান্তিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলল, না না—সেসব কারবার না। পীরের চরে 'ওরসের' মেলা বসেছে না? সেখানে ফাংশান করব!

ওর ফাংশান করা ব্যাপারটা বিরাং জানে। সামনে রুমাল বিছিয়ে দিয়ে পাখপাখালি জন্তুজানোয়ারের ডাক ডেকে লোককে আনন্দ দেবে। পয়সা পড়বে রুমালে। এলাকার লোকে ভারি উপভোগ করে হরবোলার ডাক।

বিরাং বলে, তাই বলো। তা হ্যাঁগো, পীরের চরে যে যাবে, পারমিট করিয়েছ তো?

শচী তার হাতটা ধরে একটু তফাতে নিয়ে যায়। কাঁচুমাচু হেসে বলে, এবার নাকি বড্ড কড়াকড়ি শুনলুম। দোকানওলাদের পারমিট দিয়েছে মাত্র জনাকতককে। আর মানসিকে যাবার বেলাতেও এবার গভমেণ্টের কড়া নজর। আমার একজন জানাশোনা আছে কালেক-টারেতে। বলল, মেরেকেটে পঞ্চাশ ষাটজনের বেশি যেতে দেবে না। ওপার থেকেও পঞ্চাশ ষাটজনের বেশি পারমিট পাবে না।

বিরাং বাধা দিয়ে বলে, আরে বাবা, তুমি পেয়েছ কিনা বল!

হতাশ মুখে শচী বলে, পাই নি খামরুজ্যাঠা। তোমার ভরসায় এসেছি। চেক করতে গেলে যাবে এই ক্যাম্পের লোকেরা।

দেখছি। বলে বিরাং পা বাড়ায়।

শচী হরবোলা ঘুঘু ডাকতে ডাকতে তার পিছু নেয়। মেছুনীরা খিলখিল করে হেসে ওঠে। ঘুরে শচী বলে যায়, ঘুঘু দেখছ দিদিরা, ফাঁদ দেখনি, তাই হাসছ।

যুবতী মেছুনীরা কেন কে জানে লজ্জায় রাঙা হয়ে মুখ নামিয়ে বলে, মরণ!

জবা বাবার ঘরে ঢুকে বোঁচকাটার দিকে তাকিয়ে ছিল। খুলে

দেখার জন্যে মন ছটফট করছে। অথচ পারছে না।

সেই সময় হাতেমের বড় মেয়ে ইরানীর গলা ভেসে আসে—কই গো, খামরুকাকা কোথায় গেলে ?

জবা চমকে উঠেছিল। সর্বনাশ! ভাগ্যিস সে বোঁচকা খুলে ফেলে নি। ইরানী যা ঠোঁটকাটা মেয়ে! জবা বারান্দায় বেরিয়ে বলে, কী ইরানীদি! বাবা তো বেরিয়েছে।

ইরানী একটু পুরুষালী গড়নের মেয়ে। নাকটা লম্বা। গায়ের রং ফ্যাকাসে। তার বোন তুরানীকে সুন্দরী বলা যায়। দুই বোন এলাকায় শুধু নয়, দূরদুরান্তে ঘুরে বেচে বেড়ায় নানান জিনিস। মুসলমানপাড়ায় বাজারী মেয়ে বলে ওদের বদনাম আছে। ওরা গ্রাহ্য করে না। হাতেমও খুব তেজী মানুষ। একসময় ডাকাতি করে জেল খেটেছে। সে সব কিছুতেই বেপরোয়া। এই বুড়ো বয়সেও তার গায়ে অসুরের জোর আছে।

ইরানী হিন্দু বাড়ির রীতিনীতি জানে। বারান্দায় ওঠে না। উঠোনে দাঁড়িয়ে চোখ নাচিয়ে চাপা গলায় বলে, বাপজান যে বোঁচকটা রেখে গেছে, নিতে এসেছি, দাও না ভাই।

জবা একটু ইতস্তত করে বোঁচকটা নিয়ে আসে। তারপর বলে, ওতে কী কাপড় আছে ইরানীদি ?

দেখবে নাকি ? বলে ইরানী উঠোনেই বোঁচকা খোলে।

একরাশ প্যাণ্ট শুধু। জবা নিভে গিয়ে বলে, ধুস! ও ইরানীদি তোমরা সোয়েটার আনো না ?

সোয়েটার ? ইরানী কাপড়গুলো দেখতে বলে। না তো ভাই। সোয়েটার তো আসে না। খালি প্যাণ্ট। কখনও শার্টও আসে।

সেই সময় বাইরে কোথায় ঘুঘু ডাকল। বারকতক ডাকার পর ইরানী কান করে শুনে ফিক করে হেসে বলে, ও জবা, হরবোলাদা আসছে। ওই শোন।

জবা তক্ষুনি চঞ্চল হয়ে দরজার দিকে ছোটে। হরবোলাদা আসা মানেই দিনরাত্রি মজা! কী যে হাসাতে পারে ও!

॥ দুই ॥

শচী যতবার চণ্ডীতলা এসেছে, গাঁয়ের কাচ্চাবাচ্চা ছেলেমেয়েরা ভিড় বাড়িয়েছে—এই এক বিপদ। কীভাবে রটে যায় কে জানে! বিরাং তাকে চোখ টিপেছে। শচী ব্যাপারটা বোঝে। তাই বাইরে মাঠের দিকে বা পদ্মার ধারে গিয়ে ওদের মজা দিয়েছে। অবশ্য বিরাংয়ের বাড়ি ঢোকার সাধ্য কারুর নেই।

জঙ্গুলে গ্রাম। আম কাঁঠাল লিচুর বাগানের ফাঁকে ছড়ানো ছিটানো বাড়িগুলো। বিরাংয়ের বাড়িটা মাঠের প্রান্তে। এই শীতে মাঠের চষা ক্ষেতগুলো সর্ষের ফুলে হলুদ হয়ে আছে। তার ওধারে উলুকাশের বন। তারপর বাঁধ। বাঁধের নীচে পদ্মা।

শচী কিছুক্ষণ পাখপাখালির ডাক ডেকে জবাকে আনন্দ দিল। ইরানীও খুব হাসল। বিরাং বলল, খুব হয়েছে বাবা। আর নয়। এবার জামাকাপড় ছেড়ে হাতমুখে জল দাও। জবা ভাতের জল চড়াও মা।

ইরানীর বোঁচকা ধরে ফেলল শচী। থামো ইরানীদি! একখানা প্যাণ্ট ঝেড়ে যাও। টাকা কিন্তু যাবার সময় পাবে।

ইরানী বলল, যাবার সময় মানে?

শচী জোকারের ভঙ্গীতে চোখ নাচিয়ে বলল, পীরের চরে ফাংশান করতে যাচ্ছি।

তাই বলো। তা হ্যাঁগো হরবোলাদা, পারমিট পেয়েছ? শুনলাম খুব কড়াকড়ি।

কেন? তুমি মানত দিতে যাবে নাকি? কিসের গো?

ইরানী মুখ টিপে হেসে বলে, মরণ! আমি আবার কিসের মানত দেব? মেলা দেখার সখ নেই বুঝি?

বিরাং বারান্দা থেকে বলে, দিনেদিনে কী হচ্ছে বুঝিনে বাবা। লোকে তীর্থ করতে যাবে, তাও হুকুম চাই।

নীল রঙের একটা প্যাণ্ট বেছে নিয়ে শচী কোমর থেকে পা অব্দি ছড়িয়ে পরীক্ষা করে, কেমন মানাবে। জবা বলে, দারুণ হরবোলাদা। ওইটেই নাও।

ইরানী ভুরু কুঁচকে শচীকে দেখছিল। বলে, দাম কত এখনও জানিনে কিন্তু।

শচী বলে, আরে বাবা, আগেরটা যা দিয়েছি, তাই দেব। চিন্তা কিসের ?

যদি বেশি হয় ?

বাজী। এক পয়সাও বেশি হবে না। জঙ্গীপুরের ওদিকে দেখে এসেছি, বাইশ টাকা করে বেচছে। তুমি তো আমার কাছে পঁচিশ ঝেড়েছিলে দিদি। মাইরি, তুমি আমার শত্তুর।

ইরানী হাসতে হাসতে চলে যায়। শচীর সঙ্গে কোথাও-না-কোথাও দেখা হয়ে যাবেই। তারা দেশচরানী মেয়ে, শচীও তাই। হাটেবাজারে গাঁয়ে গঞ্জে ঘুরে পেটের ভাতের ধান্দায় থাকে।

শচী জবার উদ্দেশে বলে, গায়ের সোয়েটারের সঙ্গে ম্যাচ করবে, কী বলো ?

দারুণ !

শচী খুশী হয়ে বার কতক ঘুঘু ডেকে দেয়। জবা কেন কে জানে, ঘুঘু পাখির ডাক শুনতে এত ভালবাসে।

বিরাং পা থেকে সেই মিলিটারী জুতো দুটো খুলেছে। শিশির শুকিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। আর পা ভেজার ভয় নেই। শচী সেবার এসে বলেছিল, আচ্ছা খামরুজ্যাঠা, তুমি শুনেছি সারা জীবন জলের ওপর কাটিয়েছ, জলকে এত ভয় কেন ? বিরাং বলেছিল, নাঃ, ভয় কিসের ? আসলে বয়েস হয়েছে তো, আর জল ঘাঁটতে ভাল লাগে না।

শচী বলল, আরে ব্বাস ! ও জ্যাঠা, সেই মিলিটারী জিনিস দুটো না ?

বিরাং একটু হেসে বুটজুতো দুটো একপাশে সরিয়ে রাখে।

শচী কাছে এসে ফের বলে, দারুণ জুতো জ্যাঠা। ও মাসে লালগোলায় দেখছিলুম, কতকটা এমনি গোব্দাগাব্দা সাইজের জুতোর পাহাড় সাজিয়ে নীলাম হাঁকছে। তবে সাইজে বেখাপ্পা।

বিরাং ঠোঁট ফাঁক করে। একটা কথা বলতে চায়। কিন্তু দ্বিধা আসে বলে চুপ করে থাকে। সেই বিদ্‌ঘুটে ভুতুড়ে ব্যাপারটা তার জানাতে ইচ্ছে করে শচীকে। তাকে বরাবর বড্ড আপন মনে হয়। শচীর সঙ্গে তার জীবনের কতকটা মিল আছে যেন। বাবা-মা হারা একটা ছেলে নেহাৎ বাঁচার ধান্দায় কত কিছু করে ঘুরে বেড়িয়েছে। হোটেলে ও চায়ের দোকানে কাজ করেছে। রিকশো চালিয়েছে শহরে। একবার নাকি খবরের কাগজের হকার হয়েছিল। বছরটাক ট্রেনে ফিরিওলা হয়ে ও মালিশ, ঘায়ের মলম, আগরবাতি বেচে বেড়িয়েছিল। শচী সেইসব ঘটনা শুনিয়ে তামাসা করে। শুনে না হেসে উপায় নেই। অথচ ভেতরে কেমন কষ্ট বাজে। বিরাং রাঢ় এলাকার এক গেরস্থবাড়ি গরু চরাত। সেই গল্প পাল্টা শুনিয়ে তামাসার চেষ্টা করেছে। কিন্তু অমন করে বলার দক্ষতা তার নেই।

এবার শচীর সাজপোশাকে কিছুটা উন্নতির লক্ষণ সে দেখছে। ঘিয়ে রঙের পেণ্টুলের ওপর ফুলহাতা ও গলাঅব্দি ঢাকা ফিকে লাল একটা সেয়েটার পরেছে। তার ওপর ছাইরঙা কামিজ, পেতলের মোটামোটা বোতাম আছে। শহরে-বাজারে আজকাল ছেলে-ছোকরারা এগুলো খুব পরছে। শচীর চেহারা তাদের অনেকের চেয়ে সুন্দর।

বিরাং সস্নেহে ফের বলে, বাবা ছচী, জামাকাপড় বদলে হাত মুখে জল দাও।

শচী বলতে পারে না, এইতে জবা হেসে খুন হয়। শীতকাল বলে উঠোনে উনুন পাতা হয়েছে। কাঠকুটোর পাঁজা পাশে রেখে জবা পাকা গিন্নির মতো বসেছে ততক্ষণে। বাবাকে নকল করে বলে, ও ছচীদা, বাবা কী বলছে শুনছ?

শচী বলে, হুঁউ। কিন্তু বড্ড শীত তোমাদের দেশে। তাই

জ্যাঠার কথা কানে নিচ্ছি না।

সে টের পায়, ওই বাক্যটা বিরাম খামরুর স্নেহের প্রকাশ। যাকে সে পছন্দ করে, তাকে বারবার ওই একই কথা বলে—জামাকাপড় বদলে হাতমুখে জল দাও।

বিরাং ছাইরঙা শালখানা কোমরে জড়িয়ে হাফ শার্টের বুক পকেট থেকে একগুচ্ছের নোট বের করে গুণছে। জিভে আঙুল ঠেকিয়ে নোট গোণা স্বভাব ওর। বারকতক গুণে ফের পকেটে ঢুকিয়ে রাখল। তারপর ঘরে ঢুকল।

জবা বলে, ও ছচীদা!

শচী মুখ ঘুরিয়ে বলে, ছচী-টচী বলার রাইট খামরু জ্যাঠা ছাড়া কারুর নেই। আমি জবাবই দেব না।

জবা আস্তে বলে, ন্যাকামি!

শচী দৌড়ে এসে ওর কান ধরবার ভঙ্গী করে। সত্যিসত্যি ধরবে না অবশ্য। তারপর সে বিরাংয়ের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বলে, জ্যাঠা! তোমার মেয়ে গাল দিচ্ছে।

জবাও চেঁচিয়ে বলে, না বাবা! তোমার ভাইপো আমার কান ধরছে।

বিরাং ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে একটু হাসে। শচীর সঙ্গে তার মেয়ের একটু মাখামাখিকে সে সরল মনেই নেয় বরাবর। আসলে শচীর বিরুদ্ধে কোনও বদনাম সে শোনেনি। নিজেও পরীক্ষা করে দেখেছে, শচী সেসব লাইনের ছেলেই নয়। জবার সঙ্গে তার সম্পর্কটা দাদা-বোনের মতো। তাছাড়া সবচেয়ে বড় কথা, নিজের মেয়ে বলেই বিরাং বুঝতে পারে, জবাও তেমন মেয়ে নয়।

বিয়ের পর স্বামীর ঘর মোটে মাসতিনেক করেছে জবা। হতভাগী মেয়ের কপাল, আর বিরাংয়েরও চরম বোকামি, জামাই নির্মল বেঘোরে মারা পড়ল।

নির্মল ছেলেটির সাহস আর ডানপিটেমি দেখেই মনে ধরেছিল বিরাংয়ের। চণ্ডীতলা থেকে মাইল তিনেক দূরে ডোমনীগড়ায়

ওদের বাড়ি। পাটোয়ারীজীর চোরাচালানী দলের এক সেরা পাণ্ডা হয়ে উঠেছিল সে। সেই সূত্রে চেনাজানা হয়। 'পরে বিরাং জানতে পারে, দুর্ধর্ষ প্রকৃতির এই ছেলেটি তাদেরই স্বজাতি। তখনই ডোমনীগড়ায় গিয়ে কথা পাকা করে আসে। মেয়েকে রেখেছিল ওর মাসিবাড়ি বিনোদিঘীতে। জোর করে নিয়ে আসে রাতারাতি।

বিয়ে হল জষ্টি মাসে। ভাদ্র মাসে তখন পদ্মা রাক্ষুসী। এক রাতে পাটোয়ারীজীর নৌকোয় ওপার থেকে মাল বোঝাই করে পাড়ি দিয়েছিল নির্মল। সে নিজে নৌকো বাইত না। বিরাংয়ের মত পাটনীগিরি তাকে করতে হয়নি। মোটামুটি জমিজমা ছিল ওদের। নৌকো যখন খানিকটা এগিয়েছে, হঠাৎ তুমুল ঝড়বৃষ্টি এসে গেল। মাঝামাঝি আসতে আসতে আর বাঁচানো গেল না নৌকো। একজন পাটনী কোন রকমে বেঁচে গিয়েছিল। সে ভাসতে ভাসতে ডাকিনীর চরে গিয়ে ওঠে। বাকি চারজন আর ফেরেনি।

জবা তখন ডোমনীগড়ায়। দুদিন পরে বিরাং খবর পেয়ে গেল।...

তবে জবা বিধবার বেশ পরে থাকতে চায় না। বিরাংয়েরও সেটা ভাল লাগে না। ধর্মকর্মে তার মতিগতি নেই বললেই চলে। লোকাচার গ্রাহ্য করে না। করারও কারণ নেই। আর তো ছেলেপুলে নেই যে তাদের বিয়ে দিতে হবে! অতএব কিছুদিন পালন-টালনের পর মেয়েকে সে আমিষ খেতে প্ররোচিত করেছিল। মেয়েও বাবার মত। স্বভাবচরিত্রে পছন্দ-অপছন্দে এক।

কোনও কথা উঠলে বিরাং বলেছে, যখন মরব, বুঝলি জবা? কেউ গতি না করে—তুই আমার ঠ্যাঙে বিচুলির দড়ি বেঁধে টানতে টানতে পদ্মায় ফেলে দিয়ে আসিস। পারবি নে?

জবা সকৌতুকে বলেছে, পারব না।

কেন পারবি নে?

অত বড় মানুষটা তুমি। আমার গায়ে অত জোর নেই!

বিরাং হো হো করে হেসেছে—তাহলে এক কাজ করিস। টাকা রেখে যাব অনেকগুলো কেমন তো? তুই কালীতলায় মধু ডোমকে ডেকে আনিস। ব্যস!

একটু পরে ফের আনমনে বলেছে, শুধু তোর জন্মে একটু ভাবনা হয়।

জবা বলেছে, কিসের ভাবনা? আমার মড়ার তো?

বিরাং হঠাৎ বদলে গেছে। তেতো মুখে বলেছে, আহা! থাম তো বাবা! হলো একটা কথার কথা! ঠাট্টাতামাসাও বোঝে না।

চণ্ডীতলায় বিরাং খামরু কতকটা একঘরে মানুষের মতো আছে, এটা ঠিকই। গাঁয়ে তার স্বজাতি আর নেই। তার ওপর তার পয়সাকড়ি আঁচ করে অন্যদের চোখ টাটায়। পারলে অন্যসব মানুষ চালানীরা বিরাংকে বিপদে ফেলতে ছাড়ে না। পারে না এই যা। বিরাংয়ের সঙ্গে হাতেম আর জনাই থাকায় ওরা ঘাঁটাবার সাহস পায় না। ওদিকে শহরের পাটোয়ারীজীর দৌলতে বর্ডার পুলিশ বা অন্যান্য সরকারী লোকেরাও বিরাংকে খাতির করে চলে।

অবস্থা বদলে গেছে দিনে দিনে। সমাজ-টমাজ এখন অন্যরকম। এই তিরিশ বছরে বর্ডার নামে নতুন এক শক্তিমান রহস্যময় দেবতার আবির্ভাব ঘটেছে। মুঠোমুঠো টাকা ছড়াচ্ছেন সেই দেবতা। সমাজ লোকাচার ওসব এখন নেহাৎ কথার কথা।

আগের দিন হলে হাতেমের মেয়েরা এমন করে এদেশ সেদেশ জিনিস বেচে বেড়াতে সাহস পেত না। সবাই জেনে গেছে, টাকা কী জিনিস। ইরানীর বিয়ে দিয়েছিল হাতেম। ইরানী স্বামীর ঘরে টেঁকে নি বেশিদিন। হাতেম বুড়ো হলেও তার দাপট যায় নি। গায়ের জোরে তালাক নিয়ে এসেছিল মেয়ের। ওর জামাই ছিল নেহাত ক্ষেতমজুর। তালাক না দিলে বিপদে পড়ত।

তুরানীর বিয়ের বয়স পুরনো রীতি অনুসারে পেরিয়ে গেছে। সতের-আঠারো হয়ে গেল। দেখার মত তার চেহারা। ইরানী তার বছর পাঁচেকের বড়। প্রথম-প্রথম দুই বোন মনোহারী জিনিস বেচে

বেড়াত এ গাঁ সে গাঁ। নিজেরাই শহর থেকে মাল কিনে আনত। সিনেমা দেখত। নানাজনের সঙ্গে মস্করা করে ভাব জমাত। এখন তারা আরও পেকে গেছে বাণিজ্যে। চোরাচালানে বিদেশী কাপড়-চোপড় আসে। দুই বোন বেরিয়ে যায় বেচতে। ফেরে সন্ধ্যা গড়িয়ে। শহর থেকে বাঁধের পথ ধরে আসতে ভয় পায় না। প্রতিদিনই ওপথে শহর থেকে ফিরে আসে লোকেরা। তাদের সঙ্গ ধরেই ওরা আসে।

আজ ওরা গাঁওয়ালে যায় নি। নতুন মাল আসার অপেক্ষায় ছিল। এসে গেছে। কাল ভোরবেলা দুই বোন চা-রুটি খেয়ে বেরুবে। ব্যাগে ভরে নেবে অনেকগুলো মোটামোটা যবের রুটি আর শুঁটকী মাছ বাঁটার তরকারী। ওটা ইরানীর পছন্দ। বাইরে পয়সা খরচ করে পারতপক্ষে খেতে চায় না। তুরানী একটু অন্যরকম। সে সন্দেশের দোকান দেখলে চনমন করে ওঠে। ইরানী টের পেয়ে চোখ পাকায়।

বেলা বাড়লে দুই বোন উঠোনের উনুনে রান্না চাপিয়েছে। হাতেম ঘরে কাঁথামুড়ি দিয়ে বেঘোরে ঘুমুচ্ছে। সারারাতের ঠাণ্ডা আর খাটুনির ধকল সামলে নিচ্ছে। দুপুর গড়িয়ে উঠে মসজিদের কুয়োয় নেয়ে আসবে। প্রচুর মোটাচালের ভাত আর কপির তরকারী গিলবে। তারপর বেরুবে ক্যাম্পের ওদিকে বাজারে আড্ডা দিতে।

উঁচু ভিটের ওপর ছিটেবেড়ার বড় একটা ঘর। উঠোনটা খোলামেলা। ঈষৎ বেড়ার মত অগোছাল পাটকাঠি সাজানো রয়েছে তিন দিকে। ছাগলগরু বা হাঁসমুরগির পাল আর নেই। কে দেখাশোনা করবে? বাড়িটাও অবহেলায় নোংরা। উঠোনের উনুনে পা ছড়িয়ে বসে পাটকাঠির জ্বাল ঠেলে দিতে দিতে ইরানী সিনেমার চটি বই ওল্টাচ্ছিল। সে ছোটবেলায় কিছুকাল মসজিদে মৌলবীর কাছে আরবী আর বর্ণ পরিচয় পড়েছিল। অন্তত গানগুলো পড়তে পারে।

তুরানী ছোট্ট চাটাইয়ে বসে চুলের জট ছাড়াচ্ছিল চিরুণী দিয়ে।

সেই সময়ে শচী এসে মোরগ ডাকল। সঙ্গে রাজ্যের ছানাপোনার ভিড়। শচী দৌড়ে উঠোনে উঠলে তারা নীচের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। হাতেমও কড়া লোক। বিরাংয়ের মত তার বাড়ি ঢোকার ক্ষমতা কারুর নেই।

তুরানী মুখ তুলে ওকে দেখল। শচী দু' পা ফাঁক করে সিনেমার ভিলেনের কায়দায় দাঁড়িয়ে আছে। কোমরে দুই হাত।

ইরানী জ্বলন্ত একগোছা পাটকাঠি তুলে বাচ্চাগুলোকে শাসায়—এই আটকুড়োর পাল। ভাগ্, ভাগ বলছি। ডাকব নাকি ? ডাকব ?

অর্থাৎ হাতেমকে। হাতেম ওদের কাছে দত্যিদানা। একে একে কেটে পড়ে সবাই। ইরানী ঘুরে শচীকে দেখে বলে, বাঃ! ভারি মানিয়েছে তো হরবোলাকে। যেন তোমার জন্যেই বানানো।

শচী বলে, শুধু প্যান্টের প্রশংসাই করছ দিদি। বলছ না আমি কেমন পোজ দিয়েছি।

তুরানী একটু হেসে বলে, হ্যাঁ রে বুবু (দিদি), হরবোলাদাকে কার মত দেখাচ্ছে বল্ তো ?

ইরানী একটু ভেবে বলে, দাঁড়া মনে করি।

শচী বলে, থাক। আর মনে করার দরকার নেই। আমিই বলে দিচ্ছি, অমিতাভ বচ্চন।

দুই বোন একসঙ্গে সাড়া দেয়। ঠিক, ঠিক—অমিতাভ বচ্চন।

শচী গুণগুণ করে একটা হিন্দী ফিল্মের গান ধরতেই ইরানী লাফিয়ে ওঠে। দৌড়ে ঘরের ভেতর থেকে একটা ট্রানজিস্টার এনে বলে, এ মা! আমি ভুলেই গেছনু রে। আজ 'ধরম করমে'র গান আছে।

ট্রানজিস্টারটা ইরানীর প্রাণ। কোলে রেখে সে গান শোনে। শচী হতাশ ভঙ্গীতে বলে, নাও। এলুম দুটো সুখদুঃখের গল্পসল্প করতে। আর ওই ফ্যাচাং লাগালে। আয় রে ভাই তুরানী, আমরা গল্প করি।

তুরানী চোখ নাচিয়ে বলে, কেন ? জবারাণীর সঙ্গে গল্প জমল না বুঝি ?

শচী অনেকটা জিব বের করে—এই! ওসব বলো না, পাপ হবে।

তুরানী হাসে—যাঃ। আমি কি খারাপ কিছু বলেছি?

শচী কেন যেন গম্ভীর হয়ে ওঠে—না, না। তা নয়। জবা বড্ড ভাল মেয়ে। জানো, ওকে দেখলেই আমার আরেকজনের কথা মনে পড়ে যায়।

সে আবার কে?

বহরমপুরে আচায্যিপাড়ায় এক বাড়ি রান্নার কাজ করতুম। শচী একটু তফাতে একগোছা পাটকাঠি টেনে নিয়ে বসে। তারপর বলে, সেখানে একটা মেয়ে ছিল। তার নাম মঞ্জু। আমাকে খুব খাতির করত। মেয়েটার বয়স জবারই মত। বিয়েও হয়েছিল। তো··

ওকে চুপ করতে দেখে তুরানী বলে, তারপর কী হল হরবোলাদা?

তো হঠাৎ একদিন খবর এল, জামাইবাবুর অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে। অফিসার ছিলেন ভদ্রলোক। সবে বিয়ের পর মঞ্জু বাপের বাড়ি ফিরেছে। তখন এই ব্যাপার।

তুরানী জিভ চুকচুক করে বলে, আহা রে।

একটু চুপ করে থাকার পর শচী বলে, কখনও-কখনও ওদিকে গেলে একবার যাই ওদের বাড়ি। তবে বড্ড কষ্ট হয়। বুঝলে?

তুরানী বলে, আবার বিয়ে দিলেই তো হয়। দিচ্ছে না কেন হরবোলাদা?

ইরানীর এক কান এদিকে ছিল। বোনের প্রতি সে সব সময় সতর্ক, যদিও সে শচীকে কোনদিন অসচ্চরিত্র ভাবে না। বলে, মরণ! হেঁদুর মেয়ে যে রে ছুঁড়ী। বিধবা হলেই তো সব শেষ।

শচী বলে, আরে না না। আজকাল বড় ফ্যামিলিতে ওসব কেউ মানে না। তবে মঞ্জুর বাবা ভদ্রলোক অন্তরকম। তাছাড়া মফঃস্বল টাউন তো। নইলে···

তুরানী মুখ টিপে হেসে বলে, নইলে তুমিই বিয়ে করে ফেলতে তো?

শচী ফের অনেকটা জিভ করে মাথা দোলায়। তারপর বলে, মঞ্জুও জবার মত থাকে, বুঝলে? আমার খালি অবাক লাগে, বিরাং জ্যাঠা তো গাঁয়ের মানুষ। একেবারে লেখাপড়া জানে না।

বলেই সে হঠাৎ ফিক করে হাসে। এই, জানো? খামরু জ্যাঠার এক আজগুবি কাণ্ড হয়েছে? এই ইরানীদি, নামাও তো বাপু জ্যাচাংটা। কথা শোন।

ইরানী আওয়াজ একটু কমিয়ে দিয়ে বলে, কী?

শচী গলা চেপে বলে, জ্যাঠার সেই মিলিটারী বুট, বুঝলে? মানে, যেটা পাঁচ টাকায় কোন সেপাইয়ের কাছে কিনেছিল, সেই জুতো দুটো মাইরি ভুতুড়ে জুতো!

তুরানী চোখ বড় করে বলে, তার মানে?

শচী হাসির সঙ্গে বলে চলে, খামরুজ্যাঠা রাতবিরেতে একলা যখনই বেরোয়, জুতো দুটো জ্যান্ত হয়ে ওঠে। তখন জ্যাঠার বশে আর চলে না। বলল, গত রাতে চরে গিয়ে হঠাৎ টের পেল, সে ভুল জায়গায় হেঁটে বেড়াচ্ছে খালি। আর নিজের শরীরটাও নাকি আর বশে থাকছে না। অন্য কেউ ঢুকে পড়েছে।

বলে শচী বিরাং খামরুর গলা ও ভঙ্গী অবিকল নকল করে। ক্যারিকেচারে সে ভারি পাকা। বলে, বুঝলে বাবা ছচী? কাল আমার গায়ে এক ছটাক রক্ত ছিল না। আমি মড়া মানুষের মত ঘুরে বেড়িয়েছি কোথায়-কোথায়। বাবা ছচী, এখন কী করি বলো দিকি? ফেলে দিতেও বাধে। পাঁচ-পাঁচটা টাকা—এদিকে জুতো দুটোও খুব কাজের।

দুই বোন হাসতে থাকে। অবিকল খামরুবুড়ো কথা বলছে যেন।

শচী বলে, এর পরই জ্যাঠা কী বলল জানো? বাবা ছচী, জামাকাপড় বদলে হাতে মুখে জল দাও।

অনেক হাসাহাসির পর ইরানী ঠোঁট বাঁকা করে বলে, চণ্ড বুড়োর। ও তো নিজেই এক ভূত। তা হ্যাঁ গো হরবোলাদা, পীরের চরে 'ওরমে'র মেলায় তাহলে সত্যি যাচ্ছ?

যাব না তো, তোমার প্যাণ্টের দাম কিসে শুধব দিদিমণি?

এ কথায় ইরানীর গলা ও ভঙ্গীর অনেকটা নকল আছে। ইরানী চোখ পাকাল। তুরানী খুঁচিয়ে দেয় চোখের ইসারায়। চালিয়ে

যাও হরবোলাদা।

শচী ফের ইরানীর ক্যারিকেচার করে।...দশমণী পাছা নিয়ে মিনসে এসেছে পেণ্টুল কিনতে। মাপ দিয়ে বানাও গে না। তাই বলে বেচা মাল ফেরত নেব না।

তকিপুরের হাটে ব্যাপারটা ঘটেছিল। শচী সেখানে আসর জমিয়েছিল। গণ্ডগোল শুনে গিয়ে দেখে ইরানী এক হোঁৎকা মোটা লোকের সঙ্গে লড়াই দিচ্ছে। লোকটা খালি বলছে, পাছায় না হলে কী করব? ইরানী বলছে, মিথ্যে কথা। এ জিনিস সায়েবরা পরে। তাদের মাপে বানিয়েছে। সাহেবদের পরা জিনিস বরঞ্চ ঢিলে হবে তো আঁটো হবে না। ও কথা শুনবই না।

শচী গিয়ে ক্যারিকেচার করে-টরে সব মিটমাট করে দিয়েছিল। শচীকে সবখানেই লোকেরা ভালবাসে। ওর কথায় কী যেন যাদু আছে। শচী বলেছিল, কই, চলুন তো দাদু! আড়ালে চলুন। আপনাকে আমি নিজের হাতে পরিয়ে দিচ্ছি। যদি অাঁটো হয়, এই দেখুন ছুরি আছে। আপনার পাছাকে সাইজমাফিক করে দেব। তাই বলে এসব ফরেং জিনিস নষ্ট করা যায়? সায়েবদের জিনিস। ওরে বাবা।

সারা ভিড় জুড়ে তখন হাসির ঝড় বইছে। বোঝা গেল, আসলে লোকটির রঙ পছন্দ নয়। পরে শচী বলেছিল, ব্যাটা বউয়ের কথায় ওঠে বসে, বুঝলে ইরানীদি? বটগাছের পেছনে দেখলুম, মোষের গাড়িতে ওর বউ বসে আছে। শূর্পনখা বললেই চলে মাইরি! শেষ পর্যন্ত তাকে বউদি-টউদি করে অনেক মেহনতে বোঝালুম এমন রঙ আপনার কত্তার গায়ে দারুণ মানাবে।

এতে শচীর পরিচয়ও পাওয়া যায়। সে যতটা সাধ্য উপকার করতে ছাড়ে না চেনাজানা মানুষের। যেচেপড়ে কতজনের ফাই-ফরমাস খেটে দেয়। ইরানীরা দেখেছে, বাসে আসতে আসতে শচী এক বউয়ের কোলের বাচ্চাটা টেনে নিয়ে সারা পথ আদর করতে করতে এল। বাচ্চাটা যা কাঁদছিল। এমন ছেলে শচীর দুনিয়া জুড়ে

কুটুম্ব হওয়া স্বাভাবিকই।

কথায়-কথায় ফের পীরের চরের মেলার কথা ওঠে। কাল বিকেল থেকে শুরু হবে পীরের জন্মোৎসব। দিন সাতেক চলবে। পদ্মার মধ্যে একটা কতকালের পুরনো চর যেন পীরের অলৌকিক মহিমায় টিঁকে আছে। একজন দরবেশ ছাড়া আর কেউ থাকে না ওখানে। তিনিই দরগার সেবক। শুধু তাঁরই সারা বছর ওখানে থাকার অনুমতি আছে। তবে ইচ্ছে করলে আরও দুএকজন লোক তিনি রাখতে পারেন। রাখেন না। নিজের হাতেই রাঁধেন বাড়েন, তপজপ করেন একা। কখনও গাঁয়ে গিয়ে চালডাল নিয়ে যান। লোকে বলে, দরবেশবাবা সিদ্ধ পুরুষ। ইচ্ছে করলে অদৃশ্য হতে পারেন। উড়ে যেতেও পারেন। দুপারের হিন্দু-মুসলমান অজস্র শিষ্য আছে তাঁর। নেতারাও মাঝে মাঝে দর্শনে আসেন। ওপার থেকেও।

ইরানী মনমরা হয়ে বলে, কতবার গেছি ছোটবেলায়। আজকাল পেট-পেট করে ব্যস্ত। মেলা কবে-কবে চলে গেল, জানতেও পারিনে।

তুরানী বলে, বুবু! চলনা আমরা যাই। আমি কখনও যাইনি রে!

ইরানী বলে, ধুর! পারমিট নাকি লাগবে যে! দেবেই না আমাদের।

কেন দেবে না বুবু?

ন্যাকা! ইরানী চোখ পাকিয়ে বলে। আমাদের স্মাগলার বলে বদনাম আছে জানো না?

শচী ভাবছিল। শিস দিচ্ছিল। হঠাৎ নড়ে ওঠে।...এই! খামরু জ্যাঠাকে বলব? সে মাইরি পারে। ইচ্ছে করলেই পারে। আমার ব্যবস্থা তো করে দিল!

ইরানী বলে, তোমার কথা আলাদা! তুমি তো স্মাগলার না।

ভ্যাট! আমি কি পারমিট পেয়েছি নাকি? খামরু জ্যাঠা ক্যাম্পে সেপাইদের বলে দিয়েছে।

তুরানী বাচ্চা মেয়ের ভঙ্গীতে নাকি সুরে বলে, ও বুবু! খামরু জ্যাঠাকে বল না গিয়ে!

ইরানী চোখ ইশরায় ঘরের দিকটা দেখায় অর্থাৎ বাপজান কী বলবে?

তুরানী ফিসফিস করে বলে, বাপজান বারণ করবে।

শচী হো হো করে হেসে ওঠে। বাপজানের পিত্যেশ করো বলে মনে হয় না তোমরা। যদি যেতে চাও, হাতেম খুড়োকে আমি ম্যানেজ করব। সে দায়িত্ব আমার। তুমি ইরানীদি খামরু জ্যাঠাকে গিয়ে ধরো। আমার পক্ষে আর রিকোয়েস্ট করা কঠিন। মোটেও উচিত না।...

দুপুরে শচী ব্যাগ থেকে লুঙি আর ছোট্ট তোয়ালে বের করেছে। সাবান বের করেছে। সে পদ্মায় নাইতে যাবে। জবা বলল, বাবা! ও বাবা! শুনছ, আমি হরবোলাদার সঙ্গে যাব?

বিরাং ঘরের ভেতর থেকে বলল, কোথা রে?

পদ্মায় নাইতে।

একটু পরে ভারি গলায় কথা এল, যাবি তো যাস।

জবা চোখ টিপে শচীর দিকে তাকিয়ে হাসল। শচী বলল, জ্যাঠা! তোমার মেয়ে সাঁতার জানে না কিন্তু। সেবার ডুবে গিয়েছিল। এবার ডুবলে আমি বাঁচাবো না।

বিরাং সেকথা কানে না নিয়ে বেরিয়ে এসে বলল, দেখ তো বাবা ছচী, এটা তোমার পছন্দ হয় নাকি?

শচী অবাক হয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বলল, ঘড়ি!

হ্যাঁ। ঘড়িটা অনেকদিন থেকে আছে। আমাকে মানায় না। পরিনে তাই। নাও!

আমাকে দিচ্ছ জ্যাঠা?

বিরাং শুকনো হাসে। তারপর বলে, দামী ফরেং ঘড়ি। খামোকা নষ্ট হবে। তুমিই পরো।

দুজনের চোখে পড়ল না, জবা হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে। পায়ের কাছে শাড়ির পাড় থরথর করে কাঁপছে।...

॥ তিন ॥

শচী ঘড়িটা পেয়ে যত খুশি, তত অবাক হয়েছিল। একটা হাতঘড়ির সাধ কতকালের। সে বিশ্বাস করতে পারছিল না। তার হাতে একটা ঘড়ি আছে। বার বার দৃষ্টি চলে যাচ্ছিল নিজের বাঁ কব্জির দিকে।

তার গায়ের রঙ মোটামুটি ফরসা। স্টেনলেস স্টিলের বেল্টে আটকানো জাপানী সিটিজেন ঘড়ি তার হাতে উঠলে, বিরাংও মুগ্ধ দৃষ্টে তাকিয়েছিল। তারপর আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল আকাশের দিকে। ক্রমশ আনমনা হয়ে উঠেছিল। একটা ভারি নিশ্বাস পড়েছিল তার। মনে হয়েছিল, ভুল হল, না ঠিক হল?

বিরাং এখন সর্ষের ওপর দাদন দিয়ে রেখেছে। সর্ষের খুব চাহিদা বাজারে। পাটোয়ারীজীর গদীতে দাদন দেওয়া জমিগুলোর সর্ষে নিজের তদারকিতে বেচে আসবে সে। যত টাকা ধার দিয়েছিল, তার দেড়গুণ আদায় করে বাকিটা চাষীকে দেবে। দুপক্ষেরই তাতে লাভ থাকে মোটামুটি।

বিকেলে সে পাশের গাঁয়ের মাঠে গিয়ে সর্ষেক্ষেতের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। তখনও মাথায় কথাটা ঘুরছে, ঘড়িটা শচীকে দেওয়া উচিত হল কিনা। আর সেই সময় তার মনে হল, জবা কী ভাবল। সঙ্গে সঙ্গে অপ্রস্তুত হয়ে উঠল বিরাং। সামনের ক্ষেতে সবুজ চিরোল ডাঁটার মাথায় থরে থরে সাজানো হলুদ ফুলগুলো অসংখ্য জবার মুখে পরিণত হল। সে চোখ বুঁজে রইল কিছুক্ষণ।

আজকাল তার কী যেন হয়েছে। বুদ্ধিসুদ্ধি গুলিয়ে যাচ্ছে।...

এদিকে পদ্মায় নাইতে যাবার সময় সেই দুপুরবেলা শচী বেরিয়েই যথারীতি কাচ্চাবাচ্চার দঙ্গলের মুখে পড়েছিল। তারা তার হাতে ঘড়ি দেখে একশো গলায় চেঁচিয়েছে—হরবোলাদা ঘড়ি পরেছে। ছড়ার সুর ধরে বারবার কচি কচি গলায় গেয়ে উঠেছে—হরবোলাদা ঘড়ি পরেছে। শচী অপ্রস্তুত। অহমিকায় বাধে বৈকি। এতকাল

এসেছে, তার হাতে ঘড়ি কেউ দেখেনি। সেটা কি এই ক্ষুদে মানুষগুলোরও মাথাব্যথার বিষয় ছিল? সে বিরক্ত হয়েছিল প্রথমে। পরে মনে হল, নাইতে যাবার সময়ও ঘড়ি পড়ে থাকাটা নিশ্চয় অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে। তাই এই চেঁচামেচি।

পিছু ফিরে দেখে, জবা আসছে না। শচী চেঁচিয়েছিল—কী হল? জবা জবাব দেয় নি। নিশ্চিন্দাগাছের জঙ্গলটার পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে তো আছে। শচী ভেবেছিল এই ভিড় দেখে ওর রাগ হয়েছে। তখন সে বাচ্চাগুলোকে ঢিল ছুঁড়ে তাড়াবার ভঙ্গী করেছিল। তারা অবাক। হরবোলাদকে তারা কখনও রাগতে দেখেনি।

তারা আরও মজা পেয়ে যায়। শেয়াল-কুকুর-মুরগী নানান ডাকের নকল করে শচীকেই যেন ভ্যাংচায়। হি হি করে হাসে। একটু পরে আমবাগানের পেছনে প্রাইমারী স্কুলটায় টিফিনের ঘণ্টা বাজতেই আরও একটা দল হই হই করে বেরিয়ে এসে যোগ দিয়েছিল।

বিপদ দেখে শচী দৌড়ুতে শুরু করেছিল। বাঁধের ওপাশে বালিয়াড়ি আর ছোটবড় অনেক চর, কাশকুশে ঢাকা। কোথাও কিছু গাছও আছে। তাদের ফাঁকে ফাঁকে খানিকটা করে জল আছে। কোথাও অল্প, কোথাও বেশি। চরগুলো পেরিয়ে গেলে অনেকটা দূরে স্রোতের দেখা মেলে। তবে ওখানেও মূল পদ্মা বইছে না। আরও কিছু বালিয়াড়ি পেরিয়ে গেলে আসল পদ্মার সমুদ্রের মতো বিশাল রূপটা দেখা যায়। ওপারে দিগন্তে কালো একটা রেখা। ওটাই রাজশাহী জেলা।

শচী বালিয়াড়ির আড়ালে হারিয়ে গেলে বিরাট দলটা কিছুক্ষণ বাঁধে মনমরা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর গাঁয়ে ফিরে গেল।

শচী বালিয়াড়ির নীচে একগুচ্ছ কাশঝোপের পাশে বসে দৌড়ুনোর ধকল সামলে নিয়েছিল। সামনে স্বচ্ছ নীলাভ জলটা বিশাল পুকুরের মতো। স্রোত নেই। চারিদিকেই বালির চড়া জমেছে। একদৃষ্টে ঘড়িটার দিকে তাকিয়েছিল সে। আশ্চর্য, আজ

থেকে সে একটা রিস্টওয়াচের মালিক।

জলের ধারে ঝকঝকে বালির ওপর ঘড়ি, সাবানের কৌটো, লুঙ্গি, চিরুনি এসব রেখে আণ্ডারপ্যাণ্ট পরে চোখ বুঁজে ঝাঁপ দিয়েছিল সে। বেজায় ঠাণ্ডা জলটা। হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে এসে সাবান মেখেছিল। কিন্তু সবসময় চোখ ঘড়িটার দিকে। ভূতপেবেতের মতো কেউ খপ করে তুলে নিয়ে না পালায়। চোখ পিটপিট করে বার বার তাকায়। সাবানের ফেনায় চোখ জ্বালা করলে অস্থির হয়ে ঝাঁপ দেয়।

উঠে এসে গা মুছতে মুছতে মনে পড়েছিল শচীর, গত বর্ষায় এখানে সাঁতার কেটে অবাক করে দিয়েছিল জবাকে। সে ভাল সাঁতার কাটতে পারে। জবাও খানিকটা পারে। এলাকার সব মেয়েই পারে। আজ জবা থাকলে এই হিম জলেও কিছুক্ষণ সাঁতার কাটত। চিরুণী দিয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে হঠাৎ তার মনে হয়েছিল, কই, জবা তো ঘড়িটা নিয়ে কিছু বলল না ? ইরানীর কাছে প্যাণ্টটা নেওয়ার সময় জবা বারবার বলেছিল, দারুণ মানাচ্ছে শচীদা। কিন্তু আশ্চর্য, ঘাড়ের ব্যাপার চুপচাপ রইল। তাহলে কি বাবার ওপর রাগ করে আছে সে, শচীকে বাবা ঘড়ি দিয়েছে বলে ? শচী মনমরা হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

হু হু করে হাওয়া দিচ্ছিল। বিশাল খোলামেলা আকাশের নীচে ধূ ধূ প্রসারিত পদ্মার বুকে খেলে বেড়াচ্ছিল উত্তুরে হাওয়া। জবার মন কি এতই ছোট ?

শচী সব গুছিয়ে নিয়ে পা বাড়াতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল হঠাৎ। একটু দূরে আরেকটা বালিয়াড়ির নীচে চুপচাপ বসে আছে জবা। কখন এল সে ?

ওখান থেকে আরও একটু তফাতে গাঁয়ের সর্বসাধারণের ঘাট। সে-ঘাটে লোকেরা নাইছে। জামাকাপড় কাচছে। জবা ওঘাটে যায় নি বলেই শচীর মনে হয়েছিল, তার খোঁজে এদিকে এসেছে জবা। খুঁজে না পেয়ে বসে আছে।

'একথা ভাবতেই তার মন হাল্কা হয়ে গিয়েছিল আবার। সে জবার উদ্দেশ্যে ঘুঘু ডেকেছিল। জবা একবার ঘুরে তাকিয়েছিল। অমনি শচী কাশঝোপের আড়ালে লুকিয়ে গেল।

তারপর ঝোপজঙ্গল ঘুরে এবং বালির ঢিবির আড়ালে পা টিপে-টিপে এগিয়ে সে শেয়াল ডেকেছিল। তখন জবা ঘুরে একটু হাসল।

শচী দৌড়ে কাছে গিয়ে বলেছিল, আমাকে খুঁজে পাও নি তো। আমি ভাবলুম, তুমি আসবে না। তাই যেখানে খুশি নেয়ে ফেললুম। তবে ঠিক আছে, ফের নাইতে আপত্তি নেই তোমার সঙ্গে।

জবা আস্তে বলেছিল, নিমুনি হবে। থাক।

তবে থাক। কিন্তু তুমি বসে আছ কেন? জল দেখে ভয় করছে তো। চোখ বুজে আমার মতো···বলেই শচী চুপ করে গেল।

সে হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। জবার চোখের তলায় জলের ছাপ এখনও স্পষ্ট। কাঁদছিল সে। কেন? শচী আস্তে বলেছিল, কী হয়েছে জবা?

জবা হাসবার চেষ্টা করে বলেছিল, কই? কী হবে? কিচ্ছু না।

তুমি কান্নাকাটি করছ মনে হচ্ছে!

ভ্যাট! কাঁদব কেন?

না, মাইরি তুমি কাঁদছিলে! বলে শচী তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসল। হাসাবার মতলবে সে মুখে একটা অদ্ভুত ভঙ্গি করল।

জবা বিরক্তি দেখিয়ে বলেছিল, বাড়ি যাও তো বাবা! আমাকে নাইতে দাও।

ঠিক আছে, তুমি নাও। আমি পাহারা দিচ্ছি।

আব্দার! তোমার সামনে আমি নাইব?

তাও বটে। তুমি মেয়েছেলে।···হাসতে হাসতে শচী উঠে পড়েছিল। ঠিক আছে বাবা! আমি বাঁধে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি। তুমি ঝটপট নেয়ে এস। আর শোন, জলের দিকে কখনো তাকাবে না। এক দুই তিন চার গুণে চোখ বুজে ঝপাং···বুঝেছ?

বুঝেছি। তুমি ভাগো এখন।···

বিকেলে বিরাং খামরু নেই। শচী অভ্যাস মতো খামরু জ্যাঠার বিছানায় লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে নিয়েছে। উঠতে সূর্য তখন গাছপালার আড়ালে। জবা বারান্দা থেকে ডেকে ওঠায়। হাতে চায়ের গ্লাস। কিন্তু এই প্রথম শচী দেখল, জবা কেমন যেন আড়ষ্ট। ঘরে ঢুকে লেপ টানাটানি করে তাকে ওঠাল না। বাইরে থেকে ডেকেছে। শচী বেরিয়ে গিয়ে বেলা দেখে বলে, কী কাণ্ড!

কুলকুচি করে সে চায়ের গেলাস নেয়। তারপর বলে, জ্যাঠা নেই?

জবা ঘাড় নাড়ে শুধু।

সন্দিগ্ধ শচী বলে, তোমার কী যেন হয়েছে জবা?

জবা জবাব না দিয়ে উঠোনে এটা ওটা খুটখাট করে নেড়ে বেড়ায়। একটু পরে শচী সেজেগুজে ঘড়িটা পরে বাজারের দিকে আড্ডা দেবার জন্যে পা বাড়ায়। যাবার সময় একটু হেসে জবার সামনে দাঁড়িয়ে বলে, কেমন মানিয়েছে তা বললে না তো?

জবা হাসবার চেষ্টা করে বলে, জিগ্যেস করলে বলতাম।

এখন জিগ্যেস করছি।

ভাল।

ভাল মানে? শচী লাল সোয়েটারের হাতটা কব্জি থেকে একটু সরিয়ে তার সামনে তুলে ধরেছে।

জবা বলে, ভাল মানে ভাল। আবার কী। তারপর সে কুয়োয় জল তুলতে যায়।

বাজারে গিয়ে রতনের চায়ের দোকানে গুলতানি করতে করতে এক সময় আলো জ্বলেছে। তখন বিরাং খামরু এল। গম্ভীর চেহারা। শচী চেঁচিয়ে ওঠে, খামরু জ্যাঠা! এস, চা খাওয়াব।

বিরাং একটু হাসে। মাথা নেড়ে বলে, না। তুমি খাও বাবা।

এখনই বাড়ি ফিরছ নাকি?

আর কী করব? যাবে তো এস। নাকি পরে যাবে?

শচী উঠল। চণ্ডীতলার বাজারে আড্ডা দিয়ে আনন্দ পায় না সে। চাষাভুষো লোকই বেশি। খালি তাকে জ্বালাতন করে।

হরবোলার ডাক শুনতে চায়। বারবার ওসব ভাল লাগে না।

কাঠের ব্রিজের কাছে এসে টর্চ জ্বালে বিরাং। কাঠগুলো এবড়ো-থেবড়ো হয়ে আছে। ঠোক্কর লাগার ভয় আছে। পাশে যেতে যেতে হঠাৎ শচী বলে ওঠে, একটা কথা জিগ্যেস করব জ্যাঠা।

কী?

কিছু মনে কোরো না জ্যাঠা। শচী আস্তে আস্তে বলে। তুমি আমার নিশ্চয় আগের জন্মের বাবা-জ্যাঠা ছিলে। কত স্নেহআত্যি করো। তো···

বিরাং ঘুরে অন্ধকারে ওর মুখ দেখার চেষ্টা করে বলে, কী হয়েছে বাবা ছচী?

তুমি আমাকে ঘড়িটা দিয়েছ। আমার মনে হচ্ছে, জবার এতে যেন রাগ হয়েছে।

বিরাং দাঁড়িয়ে পড়ে।

শচী একটু ভয় পায়। বিরাং খামরু তার কাছে রহস্যময় মানুষ। সে বলে, রাগ কোরো না জ্যাঠা! আমার মনে একটু কিন্তু ঢুকে গেছে। স্পষ্ট কথাটা বলাই ভাল। যদি···

বিরাং ঘড়ঘড়ে গলায় বলে, জবা মেয়েছেলে। সে কি ঘড়ি পরবে নাকি?

শচী বলে, তাহলে অন্য কারণে হয়তো রাগ বা দুঃখ হয়েছে ওর।

তোমাকে কিছু বলেছে বুঝি?

না, না। বলেনি কিছুই। তবে···তখন দেখছিলাম, যেন কান্নাকাটি করেছে। মুখটা কেমন ভার।

বিরাং দৈত্যের মতো সামনে দাঁড়িয়ে শুকনো হাসে। তারপর পা বাড়িয়ে বলে, ঘড়িটা আমি জামাইয়ের জন্যে কিনেছিলাম।

ও! বলে শচী চুপ করে গেল।

সারা পথ দুজনে চুপচাপ হাঁটে। বাড়ির কাছে পৌঁছে বিরাং একবার বলে, তাতে কী? তোমাকেই দিয়েছি যখন, আর কথা নেই।···

শচী এ-বাড়ি এলে বিরাংয়ের ঘরেই শোয়। বিরাং তাকে তক্তাপোষে নিজের বিছানাটা ছেড়ে দেয়। বারান্দার বাবুইদড়ির খাটিয়ায় নাক ডাকায়। তবে সময়টা শীতের। তাই ঘরেই ঢোকাতে হল খাটিয়াটা। শচী জানে, বিরাং কোনও আপত্তি শুনবে না।

এর মধ্যে স্নেহ ছাড়াও একটা গভীর সংস্কারের ব্যাপার আছে, শচী যেন টের পায়। সে বামুনের ছেলে। তার বাড়ি অন্নজল খাচ্ছে, এতেই কি বিরাং খামরু নিজেকে কৃতার্থ মনে করে? কিন্তু তেমন কোনও মনোভাব স্পষ্ট করে বোঝাও যায় না। লোকটা তো কিছু মানামানি করে না। মানুষ চালানী কারবারে কত মুসলমান ওর বাড়ি খেয়ে যায়। জাতবেজাতের বালাই নিয়ে মাথা ঘামায় না। প্রথম প্রথম জবা একটু আধটু আপত্তি দেখাত। পরে সয়ে গেছে তারও। শচী বোঝে, এইরকম লোকের পক্ষে সংস্কার ও ছুত-অচ্ছ্যুতের বাছবিচার থাকে না। চায়ের দোকানগুলোতে আজকাল ছত্রিশ জাতের লোক একই গেলাসে ঠোঁট ঠেকাচ্ছে। শহর-বাজারের হোটেলে, খাবারের দোকানেও তাই। বিরাংয়ের এই বাড়িকে গোপন হোটেল বলতে আপত্তি কিসের? শচী এভাবেই বিচার করে কথাটা।

এ তিরিশ বছরে বর্ডার নামে সেই রহস্যময় দেবতা চণ্ডীতলার অসংখ্য মানুষকে বদলে দিয়েছে। বিরাং কতবার শচীকে বলেছে, হুঁ, মানুষ চালানী কারবার বলে যত দোষ! তোমরা যে ভগমানের পিথিবীটাকেই উল্টেপাল্টে দিচ্ছ, তার বেলা? বাপ-পিসেমোর আমল থেকে দেখছি, ওই পদ্মার এপার-ওপার মানুষজনে সম্পর্ক, কুটুম্বিতে, যাতায়াত, ব্যবসা-বাণিজ্যি, লেনদেন। হঠাৎ কলম চালিয়ে হুকুমবাজী করে দিলে, এই আমি গণ্ডী টানলাম। সাবধান! গণ্ডী পেরিও না, জেলে পুরব। বাঃ! এটা কি কথা হল? দেশটা কার বাবার, তাই বুঝিনে। এই এত বড় পিথিবীটা কার? বিচার করে বলো বাবা ছচী। খামোকা হ্যাঙ্গামা না?

ঠাট্টা করে শচী বলেছে, হ্যাঙ্গামা বলেই কিন্তু অনেকের কপাল খুলে গেছে, খামরু জ্যাঠা।

হা হা করে হেসেছে বিরাং। তা যা বলেছ! তবে বাবা ছচী, আমি এসব মানিনে। বর্ডার! কিসের বর্ডার? ভগমানের পিথিবীতে বর্ডার আবার কী?

এ রাতে খামরুবুড়ো চুপচাপ। বেশি কথা বলে না। শচী সেটা লক্ষ্য করে চুপচাপ তক্তাপোষের বিছানাতেই শোয়। বিরাং খাটিয়ায় কাঁথা কম্বল মুড়ি দিয়ে সিগারেট টানে আর কাশে। পাশে জবার ঘরে ট্রানজিস্টার বাজছে। শুনতে শুনতে শচীর ঘুম আসে।

মাঝরাতে একবার ঘুম ভেঙেছিল। বিরাং দরজা খুলে বেরোচ্ছে। ঘর অন্ধকার। দরজা ভেজিয়ে দিয়ে গেল। কোথায় গেল সে? অনেকক্ষণ ঘুম এল না শচীর। আজ তো কোনও 'কুটুম্ব' আসেনি এবাড়ি।

কতক্ষণ পরে ফিরল বিরাং। তার কাশির শব্দ শোনা গেল। দরজা ঠেলে টর্চের আলো ফেলল ভেতরে। শচী বলল, বেরিয়েছিলে জ্যাঠা?

হুঁ। জেগে আছ ছচী?

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। আসছে না।

বিরাং খাটিয়ায় বসে চাপা গলায় বলল, পাটোয়ারীজীর লৌকো গেল। বলেছিল, একটু নজর রেখো। তাই বেরিয়েছিলুম। পথে এক কাণ্ড।

কী?

চাঁদটা উঠেছে। চরে দাঁড়িয়ে আছি একা। হঠাৎ···

থামতে দেখে শচী বলল, কী?

সিগারেট থাকে তো একটা দাও তো ছচী।

শচী সিগারেট দিল। দেশলাই জ্বেলে ধরিয়েও দিল। বিরাং চুপচাপ সিগারেট টানল কয়েক মিনিট। তারপর কাশতে কাশতে বলল, খুব কড়া। তো হল কী শোন, চরে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ মনে হল, আমার পা দুটো হাঁটছে, আমি দাঁড়িয়ে থাকবার চেষ্টা করছি। সে এক বিষম কাণ্ড।

শচী মনে মনে হেসে বলে, বলো কী! তারপর, তারপর?

অবিশ্বেস করো না ছচী। আমি মিথ্যা কথা বলি না পারতপক্ষে।

শচী জিভ কেটে বলে, ছিঃ!

কতকদূর যাবার পর দেখি আমি জলের ধারে চলে গেছি। আর একটু হলেই জলে পা পড়ে। বোবায় ধরে গেছে যেন। গলা দিয়ে কথা বেরচ্ছে না পর্যন্ত।

সর্বনাশ! আর রাতবিরেতে বেরিও না খামরু জ্যাঠা!

বিরাং আবার সিগারেট টানতে থাকে। চুপচাপ। এবং কাশেও। তারপর বলে, সেই সময় হঠাৎ চোখের কোণা দিয়ে দেখি ওপাশের চরের মাথা থেকে কে নামছে। তখন খানিকটা জ্যোৎস্না ফুটেছে। তবে কুয়োও (কুয়াশা) জমেছে খুব।

বিরাং আবার চুপ মেরে থাকে। ওর কথার ভঙ্গী এরকমই, শচী জানে। একটু পরে জিগ্যেস করে, তারপর?

বিরাং মুখ খোলে।...আমাকে দেখে সে থমকে দাঁড়িয়েছে মনে হলো। সঙ্গে সঙ্গে আমার ভয়টা বেড়ে গেল। আমি ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম। দেখি, বালিতে পা দেবে আছে। শেকড়ের মত। অনেক চেষ্টার পর কোনরকমে গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল। তখন আর লোকটা নেই। অমনি মনে হল, আমার আর বাঁচার উপায় নেই।

শচী চাপা স্বরে বলে, কেন মনে হল খামরু জ্যাঠা?

কে জানে! আমার ঘাড় ঘুরিয়ে আর দেখার ক্ষমতা নেই। খালি মনে হচ্ছে, সে আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। তখন অতি কষ্টে হেঁট হয়ে জুতো খুলে ফেললাম। আর ব্যস! আশ্চর্য কাণ্ড ছচী, আমার ঘোর কেটে গেল। তক্ষুনি পালিয়ে এলাম।

বলে বিরাং সিগারেটটা পায়ের কাছে মেঝেয় ঘষটে নেভায়। তার চাপা শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শোনা যায়। তারপর সে পাদুটো তুলে কাঁথাকম্বলের মধ্যে ঢোকায়। শীতের চোটে খুব কাঁপুনি হচ্ছে, এমন একটা ভঙ্গী করে।

শচী এসব বিশ্বাস করে না। বিরাংয়ের গল্পটা মনের ভুল বলে

ব্যাখ্যা করেছে সে। কিন্তু পাছে চটে যায় বুড়ো, সেকথা খুলে বলতে পারে না। একটু করে সে বলে, জ্যাঠা। আমি খরার সময় এলুম তোমার বাড়ি, মনে পড়ছে? অনেকটা রাতে চরে বেড়াতে গেলুম একা। ঠিক তোমার মতই একটা লোক দেখেছিলুম, তবে সে মানুষই বটে। বুঝলে?

বিরাং শুধু বলল, হুঁ:।

লোকটা চালানী মানুষ। ওপারের পাটনী নামিয়ে দিয়ে কেটে পড়েছে। আর সে চুপি চুরি চর দিয়ে এসে বাঁধে ওঠার ফিকির করছে। আমার সামনে পড়ে যেতেই থমকে দাঁড়াল। বললুম, কে? অমনি কাকুতিমিনতি জুড়ে দিল।...শচী খুক খুক করে হাসে। ফের বলে, ইচ্ছে করলে টাকাকড়ি নিতে পারতুম। কী দরকার? বেচারা বিপদের খবর পেয়ে চলে এসেছে। তবে বুঝলে জ্যাঠা?

উঁ? বিরাং যেন তন্দ্রার ঘোরে সাড়া দেয়।

আমাকে একখানা ছাপানো কার্ড দিয়েছিল। ওপারে যদি যাই, ওর সঙ্গে দেখা করি যেন। ও ঢাকায় থাকে, খামরু জ্যাঠা!...শচী উৎসাহ দেখিয়ে বলতে থাকে। তারপর অনেক চিঠিপত্তর লেখালেখি হয়েছে আমাদের। যেতে লেখে। আমার ইচ্ছে আছে, একবার যাব। দেখে আসব ঢাকা। আমরা এখন বন্ধু হয়ে গেছি।

শচী ফের হাসে। তখন খামরুবুড়োর নাক ডাকছে।...

সে রাতে ঘুম ভাঙতে অনেক বেলা হলো। বিরাং যথারীতি ভোরেই উঠেছে। ক্যাম্পের ওদিকে বাজারে আড্ডা দিতে গেছে। জবা উঠোনের রোদে চাটাই পেতে বসে কাঁসার গেলাসে চা খাচ্ছে। উনুনে কালকুটে কেটলিটা চাপিয়ে রেখেছে। শচী বেরিয়ে এসে বলে, গুডমর্ণিং জবা!

জবা মুখ ঘুরিয়ে ওকে দেখে একটু হাসে। কিছু বলে না।

শচী উঠোনের কোণার নিমগাছ থেকে লাফিয়ে-লাফিয়ে দাঁতন কাঠি ভাঙে। তার পেস্ট ফুরিয়ে গেছে। ইচ্ছে আছে, পীরের চরের মেলায় রোজগারপাতি করতে পারলে শহরে গিয়ে পেস্ট কিনবে।

ব্রাশটা তুবড়ে গেছে। সম্ভব হলে তাও কিনবে। মনে মনে বলে, দোহাই পীরবাবা! যেন জমিয়ে 'ফাংশান' করতে পারি।

সেই সময় ইরানী এল। জবা তাকে দেখে বলে, ইরানীদি, গাঁওয়ালে যাওনি আজ?

ইরানী মাথা দোলায়। একটু হেসে বলে, আমার কপাল! কাকাকে বলে পীরের চরে যাবার ব্যবস্থা করে রেখেছি। ভাবলাম, কাছাকাছি দুটো গাঁ ঘুরে দুপুরবেলা ফিরে আসব। বিকেলে রওনা দেব হরবোলাদার সঙ্গে। তো হঠাৎ এক ওলাওঠার ব্যাটা এসে হাজির!

জবা বলে, কে গো ইরানীদি?

ইরানী জবাবে কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলে, তোমার ভাই।

শচী পা টিপে-টিপে তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। ইরানী টের পায়নি। শচী আচমকা পেছনে মোরগ ডাকলে সে চমকে ঘুরে বসে। হাসির ধূম পড়ে যায় তার। শচী বলে, শুনে ফেলেছি।

ইরানী চোখ টিপে বলে, চুপ!

সে আর বলতে! শচী সকৌতুকে চাপা স্বরে বলে। তাছাড়া আমার স্বার্থও আছে।

কিসের শুনি?

তোরাপদার জন্যে নিশ্চয় মোরগ কাটা হবে। আমি খাব!

ইরানী চোখ পাকিয়ে বলে, আজ্ঞে না। খামরুবাড়ির ভাত ধসাচ্ছ, ধসাও। তোমার যা খাওয়ার বহর দেখেছি!

শচী ওর ক্যারিকেচার দেখিয়ে কপালে হাত চাপড়ে বলে, হা আল্লা! আমাকে পেটের বদনাম দিচ্ছ?

ইরানী ওর পা খামচাতে হাত বাড়ালে শচী লাফ দিয়ে সরে যায়। কুয়োতলায় গিয়ে জলের ঘটি নিয়ে আসে। নিজেই উনুনের কেটলি থেকে খানিকটা গরল জল ঢেলে নেয়। তারপর মুখ ধুতে ব্যস্ত হয়।

তোরাপকে চেনে শচী। লোকটা একজন জুয়াড়ী। ওপারে

কোথায় যেন বাড়ি আছে। পদ্মার এপারে বর্ডার এলাকা জুড়ে যত মেলা হয়, প্রায় সব মেলাতেই তার আসা চাই। 'পাবলিক' তাকে চেনে না। কেউ কেউ নাম শুনেও থাকবে। কিন্তু জানে না, কোন লোকটার নাম তোরাপ। এপারের জুয়াড়ীদের সঙ্গে তার বহুকালের দোস্তি এবং যোগাযোগ। এদের ওপারে নিয়ে যায় সে। ওপারেও হাটেবাজারে নানা উপলক্ষে মেলা বসে। এপারের জুয়াড়ীরা তোরাপের সাহসেই যায়।

তোরাপের সঙ্গে শচীর আলাপ হয়েছিল এই চণ্ডীতলাতেই। ইরানীদের সঙ্গে তার কী একটা আত্মীয়তা আছে। কালীতলার মেলায় তোরাপ সেবার খেলতে এসেছিল। শচীর সঙ্গে এত ভাব হয়েছিল যে শচী তার ছকেব পাশে বসে জমিয়ে দিয়েছিল খেলা। বাদামী চামড়ার কৌটোয় হাড়ের গুটি নাড়তে নাড়তে তোরাপ ছকের ওপর যেই উপুড করে চেপে রাখছিল, শচী তোরাপের গলা নকল করে চেঁচাচ্ছিল ঃ আমিরকে করি ফকির, ফকিরকে করি আমির। এ তুনিয়াদারি, ছক্কাপাঞ্জার খেল-খেলাড়ি! তোরাপের গলাটা সামান্য খোনা। তোরাপ শচীর ওপর রাগ করে না।

পীরের চরে এবার যে শোনা যাচ্ছে, খুব কড়াকড়ি—তাহলে তোরাপ কোথায় খেলবে বলে এল? তারপর শচীর মনে পড়ে যায়, গত রাত্রে বিরাং খামরু একটা লোক দেখেছিল চরে। কী কাণ্ড! তাহলে নির্ঘাৎ তোরাপ জুয়াড়ীকেই দেখেছিল সে। বিরাং ফিরলে ভুলটা ভাঙাবে সে।

ইরানী কিছুক্ষণ জবার সঙ্গে গল্প করে চলে গেল। শচী নিজের হাতে চা করে খেয়ে বাজারের দিকে যায়। দাড়ি কামানো দরকার।

সাঁকোর কাছে বিরাংয়ের সঙ্গে তার দেখা হল। শচী চোখ নামিয়ে বলে, ও জ্যাঠা, পীরের চরে এত শত কড়াকড়ি শুনেছি, আবার দেখছি সব ফক্কিকার।

বিরাং বলে, কেন গো?

তোরাপ জুয়াড়ী এসেছে। ইরানী দি বলল।

তোরাপ এসেছে? ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকে বিরাং। হাত বাড়িয়ে সাঁকোর রেলিংটা একবার ছোঁয়। আঙুলটা সে অকারণ ঘষে কাঠে, যেন চুলকে নিচ্ছে।

শচী হাসে।...তাহলে বোঝা যাচ্ছে জ্যাঠামণি, কাল রাতে তুমি তোরাপদাকেই দেখেছিলে!

বিরাং বলে, কে জানে! তারপর গম্ভীর হয়ে চলে যায়।

শচী একটু অবাক হয়েছে বরাবর। জুয়াড়ীদের বিরাং খামরু দুচোখে দেখতে পারে না। একথা ঠিক, কাল রাতে সে যদি টের পেত লোকটা ভূতপ্রেত নয়, তোরাপ আলি—তাহলে নিশ্চয় তাকে ধরিয়ে দিতো। শচী জানে, এখন আর তা সম্ভব নয় খামরু বুড়োর পক্ষে। কারণ তোরাপ হাতেমের বাড়ি আশ্রয় নিয়েছে।

তোরাপের বয়স চল্লিশ-বেয়াল্লিশের বেশি নয়, কিন্তু তাকে আরও বেশি বয়সের লোক দেখায়। কারণ সারা জীবন রাত জাগা আর এদেশ সেদেশ বেড়ানো, নানা ওঠাপড়া ও ঘাতপ্রতিঘাতে তার চেহারা বড্ড পোড় খেয়ে গেছে। চোখের তলায় কালির স্থায়ী ছোপ জমেছে। গায়ের রঙ মোটামুটি ফর্সা ছিল। ক্রমশ ফ্যাকাশে হয়ে পড়েছে। চুল এ বয়সেই প্রায় পেকে গেছে। একটু লম্বাটে রোগা গড়নের মানুষ সে। সাধারণভাবে জীবন যাপন করলে তার চেহারার মধ্যে নিশ্চয় শ্রী ফুটে উঠত। সে মোটামুটি লেখাপড়া জানে। ভদ্রলোকের মত সেজেগুজেই থাকে। প্যাণ্ট শার্ট পরে। তার কথাবার্তায় শচীর মতই পদ্মা অঞ্চলের টানটা নেই।

হাতেম তাকে দেখে উদ্বিগ্ন হয়েছিল। এবার সত্যি বর্ডারে কড়া নজরদারি চলছে সরকারের। তোরাপ তা জানে না এমন নয়। ওপারেও একই অবস্থা নাকি! হাতেম বলেছে, এ সময়টা না এলেই পারতে বাপু!

তোরাপ তার দূর-সম্পর্কের ভাগ্নে। তোরাপ বলেছে, তোমাদের ভরসায় চলে এলাম মামু। আসল কথাটা খুলেই বলি। ও মাসে

মাথায় পোকা কামড়াল, সিরাজগঞ্জে গেলাম খেলতে। দেড় হাজার টাকা লস খেলাম। একেবারে ফতুর হয়ে গেছি।

হাতেম বলেছে, তাহলে বেশ কিছুদিন থাকবে বলে এসেছ?

হ্যাঁ। না থেকে উপায় কী? হয়তো রাঢ় মুল্লুকেও যাব। তোরাপ জানিয়েছে তার মতলব। বহরমপুর পেরিয়ে কান্দীর ওদিকে একটা বড় মেলা আছে। সেখান থেকে বীরভূমে। তারপর দুমকা ঘুরে মোতিহারী হয়ে পূর্ণিয়ার ছোটখাট মেলায় ঘুরবে সে। তারপর বাড়ি ফিরবে মালদা হয়ে। অত দূর-দূরান্তের লোক টেরই পাবে না, সে অন্য দেশের নাগরিক। তোরাপের সে ক্ষমতা আছে।

আসলে জুয়াড়ীরা পরস্পর একমন একপ্রাণ। যতই প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাইরে বাইরে থাক, ভেতরে-ভেতরে সবাই এককাট্টা। আপদে-বিপদে জোট বেঁধে দাঁড়ায়। তাদের কোনও নিজস্ব দেশ নেই, জাত নেই। তারা কোনও রাজ্যের নাগরিক বলে মনেও করে না নিজেদের। তারা চেনে শুধু ছকের ছ'খানা গুটির নকসা আর টাকাকড়ি। তারা চামড়ার কৌটোর মধ্যে গুটির ভাষা বোঝে। অন্য ভাষা কানে নেয় না।

যা ভাল বোঝ, করো। দেখো, যেন আমরা বিপদে না পড়ি। বলে হাতেম নিজের কাজে বেরিয়ে গেছে।

তোরাপের ঘর থেকে বেরুনোর উপায় নেই। কারও চোখে পড়লেই মুশকিল আছে। বর্ডার ক্যাম্পে আগে ভাগে তার লোকেরা সব ঠিকঠাক করে রেখেছে। তাহলেও 'পাবলিক' বলে একটা ব্যাপার আছে। পাবলিক জুয়াড়ীদের ওপর খুশি নয়। তাদের চাপে রক্ষীবাহিনী বা পুলিশকে অনেক সময় আসামী চালান দিতে হয়। তোরাপ দু' একবার এমন ঘা খেয়েছে।

ইরানী পাড়া বেড়াতে বেরিয়েছে। তুরানী রান্নার যোগাড়ে ব্যস্ত ছিল। তোরাপ অন্ধকার ঘরে বসে শেয়ালের দৃষ্টে তুরানীকে দেখছিল। উঠোনে শীতের সোনালী রোদে তুরানী পরীর মতো যেন নেচে বেড়াচ্ছে।

তোরাপের অনেকদিনের গোপন সাধ, তুরানীকে বিয়ে করবে। হাতেমমামার কাছে কথাটা তুলব তুলব করে সাহস পায় না। সে শুধু ইরানীর ভয়ে।

ইরানী চায়, তোরাপ তাকেই নিকে করুক। যখনই তোরাপ এ বাড়ি এসেছে, ইরানীর সেদিন গাঁওয়াল কামাই। একটা শক্ত অছিলা দেখিয়ে পশার সাজিয়ে বেরুবে না। তুরানীর পক্ষে একা যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ইরানী তার বোনকে সেদিন নানা ছুতোনাতায় বাইরে পাঠাবে এবং তোরাপের কাছে এসে বসে থাকবে। চাপা গলায় ভ্যানর ভ্যানর করবে। তোরাপ বিরক্ত হয়। কিন্তু ভাল করে থাকা ছাড়া উপায় নেই। ইরানী সহজ মেয়ে নয়। সে জানে।

তোরাপ বারকতক তুরানীকে ডেকেছে নানা ছলে। তুরানী কিছুতেই ঘরে ঢোকেনি। বারান্দা থেকে বলেছে, বলুন ভাইজান।

তুরানী তাকে আপনি-টাপনি করে। গায়ের কাপড় ভাল করে জড়িয়ে সামনে যায়।

কতক্ষণ পরে তুরানী হয়তো বাধ্য হয়ে কী একটা কাজে ভেতরে এল। তখন তোরাপ তাকে বাগে পেল। একটু হেসে বলল, তুরানী, আমি মানুষ, না বাঘ?

কেন ভাইজান?

এমন ভাব করছ যেন আমি খেয়ে ফেলব এক্ষুনি। বলে তোরাপ হাত বাড়াল। শোন। এখানে এস। কথা আছে।

অন্ধকারে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে তুরানী বলে, বলুন না। কান আছে শুনতে পাব।

তোরাপ তক্তাপোষ থেকে উঠে তার একটা হাত ধরে ফেলে। কিন্তু ঠিক সময়েই বাইরে ইরানীর সাড়া পাওয়া যায়। হাত ছেড়ে দিয়ে তোরাপ বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসে। তুরানী দ্রুত বেরিয়ে যায়।

ইরানী বাইরে থেকে বলে, শোন তুরী! মেঘুর বউ বড় বড় পাবদা বেচতে এনেছে। জয়নালদের বাড়ি ঢুকতে দেখলাম। যা না বহিন, বাড়িতে মেহমান। কিছু মাছ নিয়ে আয়।

তুরানী বাড়ি থেকে পালাতে পারলে বেঁচে যায়, এমনভাবে বেরিয়ে গেল। তখন ইরানী হাসিমুখে ঘরে ঢোকে। বলে, বাগে পেয়ে ওস্তাদী খেল দেখাও নি তো তুরীকে?

তোরাপ জিভ কেটে বলে, তৌবা!

ইরানী নিঃসঙ্কোচে তার পাশে বসে। ঘরের দুটো ছোট্ট জানলা বাইরের বারান্দার দিকে। আর কোনও দিকে জানলা নেই। তাই অন্ধকার হয়ে আছে ভেতরটা। ইরানী কাঁপা কাঁপা গলায় বলে, এবার আর কোনও কথা শুনব না। তোমার সঙ্গে চলে যাব। আর কতকাল চালাকি করে যাবে, শুনি?

কথাগুলো ন্যাকা-ন্যাকা এবং অসহ্য লাগে তোরাপের। কিন্তু সে ভয় পায়। জানে, বাঘিনী এখন রক্ত শুষতে এসেছে। উল্টো কিছু বললে বিপদ হবে।

ইরানী তাকে বছরের পর বছর এভাবে ব্ল্যাকমেল করে আসছে। তোরাপের মনে হয়, তার শরীরের শেষ রক্তটুকু থাকতে ও তাকে রেহাই দেবে না। অথচ সব জেনেও তাকে সীমানা পেরিয়ে বারবার এপারে আসতে হবে।

॥ চার ॥

পদ্মার বুকে 'নো-ম্যানস ল্যাণ্ডে' পীরের চর। বড় দুর্গম জায়গা। দেশভাগের আগে জেলেদের বসতী ছিল। তুলে দেওয়া হয়েছে। দু'দেশের সীমানারেখার মাঝ বরাবর যে জায়গা, তার নাম নো ম্যানস ল্যাণ্ড। সেখানে বসবাসের হুকুম নেই। শুধু দু'দেশের ভক্তদের মুখ চেয়ে দু'সরকারের মধ্যে চুক্তি হয়েছিল। সেই অনুসারে পারমিটের ব্যবস্থা। দুই সরকারই জানেন, বিনি পাসপোর্টের লোকেরা এই মওকাটা ছাড়তে চায় না। সীমান্ত পেরুনো এ সময় যত সহজ, তত নিরাপদ। পারমিটধারী ভক্তদের ভিড়ে মিশে গেলেই হলো। বড়জোর চেকপোস্টে দু'পাঁচ টাকা দক্ষিণা দিলেই

হলো। তাই বছরে-বছরে কড়াকড়ি বেড়েছে।

এ সীমান্ত এমনিতেই অনেক জায়গায় দুর্গম। পদ্মার সংলগ্ন শাখাপ্রশাখা এবং দুধারের অববাহিকায় খালবিল নালা আর জঙ্গল পেরিয়ে দুঃসাহসীরা তবু সীমান্ত পেরোতে ছাড়ে না।

শচী এই প্রথম পীরের চরে এলো। বিস্তীর্ণ পদ্মার অজস্র চর আর বদ্ধ জলা অর্থাৎ বিল ঘুরে তাদের নৌকো পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। এ নৌকোয় শহর থেকে এক মাড়োয়ারী পরিবার এসেছে। পাটোয়ারীজীর লোক বিরাং খামরু চণ্ডীতলায় তাদের তদারকের ভার পেয়েছিল। সেই সুযোগে শচীকে সে দলে ভিড়িয়ে দিয়েছে। শচী লক্ষ্য করেছিল, একটি মেয়ের রোগ সারানোর উদ্দেশ্যেই দলটা চলেছে। মেয়েটির মুখে কষ্টের ছাপ দেখে সে ওর কষ্ট ভোলাতে সারা পথ হরবোলাগিরি করেছে। এর ফলে যথারীতি সে ওদের আপন জন হয়ে উঠেছে। শচী হরবোলাগিরি না করলেও ভাব জমাতে পারত। সে এতে পাকা। পরকে আপন করে নিতে তার দেরী হয় না।

কিন্তু নৌকো থেকে বালির চরে নেমেই যেমনি সে উঁচু বিস্তীর্ণ টিলার মতো পীরের চরের মাথায় মেলার আলো দেখেছে, আর পিছু ফিরে তাকায় নি। আকাশের মাথা থেকে ঝুলন্ত কুয়াশার পর্দায় আলোগুলি ঝকমক করছে চুমকির মতো। ঢোল আর গানের শব্দ ভেসে আসছে। সে ঝোপজঙ্গল ভেঙে নাক বরাবর উঠতে শুরু করে। ওপাশে একটা পথ আছে। ভিড় করে লোকেরা এই সন্ধ্যাতেই নীচের দহে স্নান করে যাচ্ছে সিন্নি চড়াতে। অনেকের হাতে লণ্ঠনও আছে। থানের কাছে পৌঁছে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখল শচী। মানতকারীরা একটা উঁচু সমাধিস্তূপের চারপাশে এই হিমের মধ্যে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে ভেজা গায়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে। কেউ কেউ কান্নাকাটিও করছে।

ব্যাপারটা মনঃপুত হলো না শচীর। সে একটু ধুলো মাথায় ঠেকাল। তারপর সিগারেট ধরিয়ে এদিক ওদিক তাকাল। আলোর

বাইরে কোথায় কী ঘটছে, বোঝা যায় না। একটু তফাতে কয়েকটা ছোট দোকানপাট বসেছে। সেদিকটা এখন প্রায় নিরিবিলি। সে চায়ের দোকানের খোঁজে গেল।

প্রকাণ্ড বটগাছটা থানের পিছনে বিশাল ছাতার মতো উঠে চারপাশে বহুদূর অব্দি ছড়িয়ে রয়েছে। অজস্র ঝুরি নেমেছে। অসংখ্য ঝুরি মোটা মোটা কাণ্ড হয়ে উঠেছে কালক্রমে। তার তলায় এসব দোকান। কাছে এসে দেখল, একটু দূর থেকে যত নিরিবিলি মনে হচ্ছিল, ততটা নয়। আবছা অন্ধকারে জোট বেঁধে লোকেরা বসে আছে। খড়কুটো জ্বেলে এখানে ওখানে আগুন পুইয়ে গা গরম করছে অনেকে। হয়তো তাদের মাঝুতে স্নানটা শেষ হয়েছে। এখন অবস্থা কাহিল। শচী ঠাহর করে দেখল, রুগ্নদের মধ্যে অনেক ছেলেমেয়েও আছে। একখানে আগুন জ্বেলে মা তার ছোট্ট বাচ্চাকে সেঁকছে দেখে শচী মনে মনে বলল, আহা রে!

বোঝাই করে অনেকে শুকনো পাটকাঠি এনেছে বেচতে। সেই পাটকাঠি জ্বেলে একখানে চা হচ্ছে। পা লাফিয়ে উঠল দেখেই। কিন্তু একটু পরে বিস্বাদ খানিকটা কালো চা খেতে খেতে তার মনে একটা হতাশাই জাগল। যা ভেবেছিল, তার সঙ্গে মিলছে না। সবাই এসেছে রোগের ধান্দায়। আমুদে লোক কই যে মেলা জমবে, কিংবা শচী তাদের জমিয়ে তুলবে?

থানের পিছনে একটা সদ্য চুণকাম করা পাকা ঘর। সেখানেই শচী সেই দরবেশকে দেখতে পেল। বারান্দায় রঙীন কাপড় বিছিয়ে বসে তিনি চামর বুলিয়ে দিচ্ছেন রোগীর গায়ে। টিমটিমে একটা হ্যাজাগ জ্বলছে। তার ম্যান্টল একপাশে ঝুলছে।

হঠাৎ শচীর মনে হল, সারা বছর এখানে এই ঘরটুকুতে দরবেশ একা থাকেন? ভারি আশ্চর্য তো! চারপাশে দুর্গম জলজঙ্গল। লোক নেই, জন নেই। জন্তুজানোয়ারও থাকতে পারে। তার মধ্যে একা চুপচাপ একটা মানুষ খালি ঈশ্বরকে ডেকেই কাটিয়ে দেন, শচীর মাথায় ব্যাপারটা ঢুকল না। কিন্তু সে অবাক হয়ে গেল।

ওখানেই বারান্দার নীচে শতরঞ্চি পেতে বসে একদল ফকির ঢোল বাজিয়ে গান গাইছে। পীরের মাহাত্ম্য গাইছে নিশ্চয়। শচী একবর্ণ বুঝল না। সে সেখান থেকে ফিরে চেনা মুখের খোঁজে বেরুল।

কাঁধে ব্যাগটা বড্ড ভারি হয়ে উঠেছে। বিরাং তাকে একটা কম্বল দিয়েছে। বলেছে, ওখানে পাটকাঠি কিনতে পাবে। খুব সস্তা। আনা চারেকের কিনলেই শোওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

শচী ক্রমশ হতাশ হলো। ধুর, ধুর। এত কষ্ট করে কেন এই প্রচণ্ড হিমে সে এখানে মরতে এল? ভেবেছিল, মেলা বলতে যা বোঝায়, তাই হবে। কিন্তু সেই মেলার এই রূপ?

ফের চা খেতে গিয়ে চা-ওয়ালা লোকটার কাছে কথাটা না বলে থাকতে পারল না। শুনে লোকটা কেমন হাসল। মাথাটাও একটু নেড়ে দিল। মাথায় মাফলার জড়ানো, তার ওপর তুলোর কম্বলও টেনেছে। ফলে প্রকাণ্ড দেখাচ্ছে মাথাটা।

শচী বলে, হাসলেন যে দাদু?

কোত্থেকে আসা হচ্ছে?

ওপার থেকে না।

এখানে ওপার-এপার বললে কিছু বোঝা যাবে না। বলুন— ইণ্ডিয়া না বাংলাদেশ?

বুঝতে পেরে শচী একটু হাসে। ইণ্ডিয়া।

এই প্রথম এলেন?

হ্যাঁ, দাদু।

অসুখটা কী?

শচী হাঁ করে তাকিয়ে বলে, অসুখ?

লোকটা ভুতুড়ে গলায় ঘোঁত ঘোঁত করে হাসে। তারপর বলে, এখানে যারা আসে, সবারই কোনও-না-কোনও রকম অসুখ থাকে। এই যে আমাকে দেখছেন, আমারও আসলে অসুখের জন্য আসা। পেটের ব্যামোয় ভুগছি।

শচী বলে, তাহলে রথ দেখা কলা বেচা দুই-ই।

লোকটা তেমনি হেসে সায় দেয়। তারপর বলে, তবে অসুখ তো নানা রকম। কারুর-কারুর আবার টাকার অসুখ। সে বড় সাংঘাতিক।

খুলে বলুন না দাদা। শচী জমিয়ে বসে।

লোকটা চাপা গলায় এবং চোখ নাচিয়ে বলে, আজ তো সবে শুরু। কালকের রাত থেকে নিজের চোখেই দেখবেন। ওই খানটায় গ্যাসবাতি জ্বেলে টাকার অসুখ সারানো হবে। সে কি দু'একজন দরবেশ? দরবেশ আসবে ডজনে-ডজনে। মেলাও জমে যাবে তখন।

এতক্ষণে শচী বুঝল সব। লোকটা জুয়াড়ীদের কথা বলছে। কিন্তু এ তো পীরের থানের মেলা। এখানে লোকেরা রোগ সারাতেই এসেছে। এখানেও জুয়ার আসর বসবে? শচীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, আচ্ছা মানুষ মাইরি, একখানা জিনিস দাদা।

তা আর বলতে। চা-ওয়ালা তাকে সায় দেয় এবং নাকের ডগা ঢেকে দেয় গলার কাছ থেকে কম্বলটা তুলে। শুধু চোখদুটো জুল জুল করে তার।

শচী এতক্ষণে হতাশার ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। টের পেয়েছে, পদ্মা সীমান্তে সব মেলার চরিত্রই আসলে এক। এ তীর্থের মেলা তার থেকে আলাদা নয়। সে ফের যখন থানের কাছে গেল, আবার একটু ধুলো মাথায় রেখে মনে মনে প্রার্থনা জানাল, দেখো বাবা! শচী বড় কষ্টে আছে।

আরও কিছুক্ষণ পরে শচী সেই মাড়োয়ারী পরিবারটির খোঁজ পেল। মানত চড়িয়ে একখানে পাটকাঠি জ্বেলে আগুন পোহাচ্ছেন। কর্তা বললেন, আমরা তো এখনই ফিরে যাচ্ছি বাবুজী। আপনি কী করবেন?

'শচী বলল, সে কী! রাতেই ফিরে যাবেন?

হ্যাঁ বাবুজী। এখানে থেকে ফায়দা কী? তাছাড়া থাকার ব্যবস্থা করে আসিনি।

শচী একবার ভাবল, ওদের সঙ্গে ফিরে যাবে। বরং কাল ফের আসবে। কিন্তু পরে ভাবল, আবার আসার সুযোগ যদি না পায়? তাই বলল, ঠিক আছে। আপনারা আসুন। আমি থাকব। মেলাটা দেখেই যাই।

মাড়োয়ারী ভদ্রলোক বললেন, কাল থেকে তো খালি জুয়াড়ীদের ভিড় হবে। ওদের খেলাড়ীরাও যাদুমন্তরের টানে এসে যাবে দেখবেন। বহুৎ ঝগড়া-কাজিয়া ভি হোবে। সেজন্য আমরা পয়লা রোজই এসেছি। সব সাচ্চা লোক আজই এসেছে। কাল যাদের দেখবেন, তাদের নাইনটি পারসেণ্ট বেমারের নাম করে ঝুটমুট পারমিট লিয়েছে!

শচী আরও খানিকটা বুঝল।

সে রাতটা সে খুব কষ্টেই কাটায়। সেই চা-ওয়ালার কাছাকাছি একটা খালি জায়গা বেছে নিয়ে পাটকাঠি কিনে আনে, বিছিয়ে দেয়। তার ওপর লুঙ্গি পেতে বিছানা করে। ওপরে বটগাছ। কিন্তু মাঝে মাঝে পদ্মা থেকে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া শিরশির করে বয়ে আসছে। হাড় জমে যাবার দাখিল। মাঝে মাঝে কোথায় শেয়াল ডাকছে। তারপর বটের পাতা থেকে শিশির ঝরা শুরু হয়েছিল। তখন শচী বিপদ টের পেয়েছিল। বাকি রাত মধ্যে মধ্যে আগুন জ্বেলে হাত সেঁকে অতি কষ্টে কাটাল সে। বিছানা শিশিরে চব চব করছিল। কেন যে ছাই এখানে এসে জুটেছিল সে? খুব বোকামি হয়ে গেছে। জীবনে নানা জায়গায় শীত বা বর্ষার রাত তাকে কষ্টে কাটাতে হয়েছে। কিন্তু এমন সাংঘাতিক কষ্ট কখনও পায় নি।

ভোরে ঘন কুয়াশা। পৃথিবী যে এত হিম হতে পারে, শচী কল্পনাও করে নি। কুঁকড়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে সে রোদের প্রতীক্ষায় কাটায়। রোদ ফুটতে আটটা বেজে গেছে। ক্রমশ চাঙ্গা হয়ে ওঠে সে। তারপর আবার কালকের সেই খুশির ভাবটা ফিরে আসে মনে। হঠাৎ যেন আবিষ্কার করে, আরে তাই তো!

তার একটা রিস্টওয়াচ আছে। কাল সারা রাত সোয়েটারের হাতার তলায় ঘড়িটার কথা একবারও মনে পড়ে নি টের পেয়ে সে আশ্চর্য হয়ে যায়।

সকালে জায়গাটা ঘুরে ফিরে দেখল। বালির চর আর জল চারদিকে। কোনও চরে উলুকাশের জঙ্গল, দু'একটা গাছ বা ঝোপঝাড়ও আছে। দূরে মূল পদ্মার স্রোতে কোথাও দু'একটা জেলে নৌকা ভেসে আছে।

এবার শচীর মনে ভাবনা হলো, খাওয়ার ব্যবস্থা কী হবে? খামরু বুড়ো বলেছিল, অনেকে দেখবে হাঁড়িকুড়ি নিয়ে গেছে। রান্না করে খাচ্ছে। তাদের কোনও দলে দু'মুঠো চাল-ডাল কিনে দিলে ব্যবস্থা হতে পারে। চাল-ডাল দরবেশ বাবার ওখানে কিনতে পাবে। ভক্তদের জন্যে উনি চাল-ডাল নুনটা তেলটা মজুত রাখেন। অসুবিধে হবে না।

শচী ভাবল, বেলা একটু বাড়ুক। তখন দেখা যাবে।

বার তিনেক চা আর একটা শক্ত পাউরুটি গিলে সে থানের কাছে দরবেশবাবার আশীর্বাদ নিতে গেল। কিন্তু তখনও যা ভিড়! অনেকে ফিরে যাবে। তাই রুগী নিয়ে বসে আছে। লাইন দেওয়ার অবস্থা। দেখে-শুনে শচী ফিরল। ওদিকে নীচের দহে নামার ঘাট অব্দি গড়ানে রাস্তাটা কাদায় পচে আছে। পাশে শুকনো বালিমাটির ওপর ঝোপঝাড় ভেঙে শচী নীচে নেমে যায়। কাল সন্ধ্যায় কোথায় নৌকো থেকে নেমেছিল, বুঝতে পারে না। সে ডাইনে বাঁয়ে তাকায়।

তারপর দেখতে পায়, খানিকটা দূরে সমতল একটা চরের ওপারে একটা নৌকো সন্ত ভিড়েছে। আর সেই নৌকো থেকে এ. দল লোক নামছে। নৌকোয় অনেক জিনিসপত্র আছে মনে হচ্ছে। সকালের মানতকারীরা আসতে শুধু করেছে তাহলে। তার চোখে পড়ে, একটি মেয়ে বালির চড়ায় দাঁড়িয়ে এদিকে তাকাচ্ছে। অমনি শচী লাফিয়ে উঠেছে। দৌড়তে শুরু করেছে।

হাতেমের ছোট মেয়ে তুরানীকে চিনতে ভুল হয়নি তার।

ইরানী আর তুরানী এসেছে হুটো মুরগি নিয়ে। মানতের মুরগি। কেটে রান্না করে দরবেশের কাছে একটা প্রকাণ্ড জালায় খানিকটা মাংস ঢেলে দিয়ে এলেই হলো। মুসলমান মানতকারীরা তাই করছে। জালাটা ভর্তি হয়ে যায় হুপুব হতে হতে। তারপব দরবেশ সবাইকে সেই মাংস বিলি করে দেন।

খুব তৈরী হয়ে এসেছে হু' বোনে। চটের পর্দা এনেছে, মাথার ওপর লটকাবে শিশির বাঁচাতে। কাঁথা কম্বল তালাই হাঁড়িকুড়ি কত কী এনেছে। শচী আনন্দে লাফালাফি জুড়ে দিল। ইবানী চোখ পাকিয়ে বলে, থামো! একা তো চুপচাপ লুকিয়ে চলে এলে! সঙ্গে নিয়ে এলে না তো! আবার এখন মাতব্বরী করা হচ্ছে বাবুর!

শচী কাঁচুমাচু মুখে বলে, কীভাবে এলুম তা তো বুঝতেই পারছ দিদি!

তুরানী মুখ টিপে হেসে বলে, হরবোলাদা! বুবু আসতে আসতে বলছিল, তোমাকে লকড়ি কুড়োতে পাঠাবে জঙ্গলে। রান্না হবে কিসে? বলছিল, হরবোলাদা দেখবি মুখ চুন করে ঘুরছে!

তা ঘুরছি। শচী মুখটা কুচ্ছিত করে দেখায়। তাই দেখে হুই বোনে হেসে অস্থির হয়।

থানের পিছনে রোদ দেখে একটা জায়গা বেছে নিয়ে গেরস্থালী পাতে ওরা। শচী বারবার বলে, দারুণ পিকনিক হবে। ভাবা যায় না! মুরগির ঝোল দিয়ে গরম গরম ভাত—ঔফ!

ইরানী ভেংচি কেটে বলে, তোমাকে দেব ভেবো না। আমরা খাব, তুমি বসে বসে দেখবে।

তুরানী বলে, হরবোলাদা যেমন! বলো না, দরবেশবাবার ওখানে গিয়ে খাব। ওখানে তো ভাত আর মুরগির মাংস বিলি করবে।

শচী লাফিয়ে ওঠে।...তবে তো কথাই নেই।

ইরানী খপ করে ওর লম্বা চুল টেনে ধরে বলে, লজ্জা করবে না ভিখিরীদের দলে পাত পাড়তে! যা বলছি, করো। ওই দেখ, সবাই

লকড়ি কুড়োচ্ছে। সোজা চলে যাও।

তুরানী বলে, আমিও যাই বুবু।

ইরানী ধমক দেয়, না। এখানে কাজ আছে। তুই কোথা যাবি? বস্ চুপচাপ।

তুরানী দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে মনমরা হয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে। শচী একটু দাঁড়িয়ে থেকে পা বাড়ায়। তারও খারাপ লেগেছে। পিকনিকের আমেজ মনে নিয়ে সে খুশিতে আটখানা হয়েছিল। ঝোপজঙ্গলে এই শীতের রোদে ঘুরে বেড়ানো বা কাঠ কুড়ানোর মজা আছে। তুরানী বা কেউ সঙ্গে থাকলে খুব জমে উঠত সেটা।

শচী ভাবে, বোনকে তার সঙ্গে একলা ছাডতে পারল না ইরানীদি। কেন? শচী কি তুরানীর সঙ্গে প্রেম জমাতে চাইত? রামোঃ! শচী ও লাইনে নেই। তার মনের তলায় খালি ভাবনা, এখানে আসরটা কেমন হবে। লোকজন জুটবে কেমন। তারা তার 'ফাংশানে' ভিড় করবে কিনা।

একমনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ শচীর অভ্যাসমত ঘুঘু ডাকতে ইচ্ছে করল। কিন্তু তক্ষুনি সংযত হলো। আগেভাগে পুঁজি ফুরিয়ে দেওয়া উচিত হবে না। হঠাৎ চমক দেবে ও-বেলা একেবারে আসরেই।...

বিরাং খামরুর বাড়িতে গত রাতে জনাপাঁচেক 'কুটুম্ব' এসেছিল। পাটোয়ারীজীর চিরকুট এনেছিল যথারীতি। বিরাং পড়তে পারে না, পাটোয়ারীজী জানে না। তার মেয়ে জবা পড়ে শোনাবে। তবে বিরাং হুঁশিয়ার। চিরকুটে পাটোয়ারীজী নিজের সইয়ের বদলে একটা আঁকাবাঁকা জটিল চিহ্ন এঁকে দেন। সেটা খুঁটিয়ে মিলিয়ে দেখে বিরাং। অনেকবার সে ঠকেছে কিনা।

এই কুটুম্বেরা অবশ্য পীরের চরে তীর্থে যাবার পারমিট এনেছে। কাজেই সেখান অব্দি যেতে তাদের অসুবিধে নেই। বিরাংকে পরেরটার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

সে একটু ভাবনায় পড়েছিল।

চণ্ডীতলার বর্ডারে পদ্মার মধ্যে দিয়ে যাবার ঘাঁতঘোঁত সে জানে। কতকাল ওই চর আর জলের গলিঘুঁজি গোলকধাঁধা পেরিয়ে সে নিজেই মানুষ চালান দিয়েছে। আজকাল হাতেম, জনাই বা জঙ্গলও এই 'রুট'টা চিনে ফেলেছে। কিন্তু পীরের চরের ওদিকের রুট বিশেষ চেনা নয় ওদের। চেনে শুধু বিরাং।

আজকাল বিরাং নিজে নৌকোর সঙ্গে ওপারে যায় না। বেশি ধকল সইতে পারে না সে। বয়স হয়েছে। অথচ পাটোয়ারীজীর এই পরোয়ানা। বিরাং জানে, তাঁকে চটিয়ে সে নিরাপদে থাকবে না। তাঁকে অমান্য করার সাহস তার হয় না। সে জানে, পাটোয়ারীজী তার মাথার ওপর থেকে সরে দাঁড়ালেই তার হাতে হাতকড়া পড়তে দেরী হবে না। বর্ডার বাহিনী এবং পুলিস জানে, বিরাং খামরু এই এলাকার এক সেরা চালানকারী। মানুষ আর মাল পাচারের বড় খুঁটি সে। পাটোয়ারীজীই বলেছেন, বিরাংয়ের নামে গোয়েন্দা পুলিশের আলাদা ফাইল হয়েছে। কাস্টমসের অফিসাররাও বিরাংকে নাকি দাগী করেছেন। বাগে পেলে ছাড়বেন না।

বিরাং অবাক হয়েছে। নাকি বড্ড বাড়িয়ে বলছেন পাটোয়ারীজী। তত বেশী সাংঘাতিক কাজ কীই বা করেছে সে? অল্পস্বল্প মানুষ-চালানী কারবার এ তল্লাটে কে করে না? কিন্তু পাটোয়ারীজীর প্রতি তার সারা জীবনের কী এক মোহ কিংবা চাপা আতঙ্কমিশ্রিত শ্রদ্ধা রয়ে গেছে, যা থেকে তার মত নিরক্ষর গেঁয়ো মানুষের বাঁচোয়া নেই। সে লোকটাকে যমের মত ভয় পেয়েছে দিনে দিনে। তাঁর ক্ষমতা দেখে বিরাংয়ের তাক লেগে গেছে অনেক সময়। দুদেশে যুদ্ধের বছরেও পাটোয়ারীজীর কারবার বন্ধ ছিল না, এটাই আশ্চর্য।...

রাতের কুটুম্বরা জনাতিন মুসলমান, দু'জন হিন্দু। কিন্তু খাওয়া-দাওয়া একসঙ্গেই হয়েছে। উপায় নেই। বর্ডারের ঘাটে সবাইকে একসঙ্গে জল খেতে হয়। ভাগ্য একই সুতোয় বাঁধা।

রাতের রান্নাটা জবাকেই রাঁধতে হয়েছিল। চাল ডাল আলু কপির একটা সাদামাটা খিঁচুড়ি। মাঝে মাঝে এ ধকল জবার ওপর দিয়ে যায়। সকালে ওদের একটা নৌকো দেখে দিয়েছিল বিরাং। সেই নৌকোয় ওরা পীরের চরে তীর্থে গেছে। মাঠের ওপাশে খালের ধারে এখন তাঁবু খাটিয়ে চেকপোস্ট হয়েছে। সেখানে পারমিট দেখাতে হয়। খালে একটা করে নৌকো আসছে তীর্থযাত্রীদের। পারমিট দেখিয়ে চলে যাচ্ছে ডোমনীগড়ার বিলের দিকে। সেই বিল পেরিয়ে দুর্গম নদীনালা হয়ে পদ্মায় ঢুকছে। তারপর পীরের চর আরও কিছুটা দূরে।

বিরাং ভাবনায় পড়ে গেছে। হাতেমের সঙ্গে শলাপরামর্শ করেছে। কিন্তু হাতেমের মনে দ্বিধা আছে। মঙ্গল আর জনাই মাঝিও কিন্তু-কিন্তু করছে। ওদিকটা বড্ড গোলমেলে জায়গা। একটু ভুল হলে বাকি রাত ঘুরে মরতে হবে পদ্মার বুকে। এমন দুর্ঘটনা কতবার কত জনের হয়েছে। কোন মুল্লুকে উঠে ধরা পড়েছে। জেলে কাটিয়ে আসতে হয়েছে ওপারে। চণ্ডীতলার সতুমাঝি তো ফিরতেই পারেনি। গুলি খেয়ে মারা পড়েছিল বেঘোরে। ওপারের পাঠান সেপাইগুলো বেয়াড়া কসাই।

জবা বাবার মুখ দেখে টের পেয়েছিল সব। বলেছে, ও বাবা! ওরা মরুকগে। তোমার কী? ওদের বলো, এখান থেকে যায় তো যাক। পীরের চরে মরতে যাচ্ছে কেন?

বিরাং একটু হেসে বলেছে, সমিস্তে। ওনাদের নৌকো থাকবে নারাঙ্গার চরে যে।

সে আবার কোথা?

ওপারে। বিরাং ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়েছে। যেখান থেকে পদ্মা পেরুলে আমিনগঞ্জ। বাজার জায়গা। আমি একবার গিয়েছিলাম সেখানে। রেলের ইস্টিশেন আছে। ওনারা সব :ব্যবস্থা করে রেখেছে। ওপারের আত্মীয়স্বজনরা থাকবে। চেকপোস্টের ঝামেলা তারাই মেটাবে।

জবা তেতো মুখে বলেছে, মরুক গে। তুমি তাই বলে যেও না।

বিরাং জবাব দেয়নি। পাটোয়ারীজীর চিঠিতে হুকুমের সুর আছে, সেটা আঁচ করেছে সে। তাছাড়া মাথাপিছু কুড়িটা করে টাকা, সেও দর হিসেবে খুব ভাল। একশোটা টাকা ছেড়ে দেবে? দিনেদিনে টাকার ওপর বিরাংয়ের নেশা চেপে গেছে। টাকার পরিমাণটাও বারবার মনে ভেসে উঠছে।...

দুপুরে খাওয়ার পর বিরাং হাতেমের বাড়ি গেল। হাতেম দাওয়ায় রোদে শুয়ে ছিল। মেয়েরা পীরের চরে গেছে মানত দিতে। ধর্মে তত মতিগতি না থাকলেও হাতেমের মনে হয়েছে, মন্দ কী! পীরবাবার আশীর্বাদ নিয়ে আসুক না! মনে জোর পাবে।

তার চেয়েও বড় কথা, তোরাপ আলিও চরে গেছে। ইরানীদের বিপদ-আপদ হলে সে একটা বড় ভরসা। ওখানে তার দলবল থাকবে।

বিরাং বলল, মিতেভাই! কী করি বলো দিকি? পাটোয়ারীজী সমিস্যেয় ফেললে দেখছি।

হাতেম হাত বাড়িয়ে বলল, আগে একটা সিগারেট দাও। বুদ্ধির গোড়ায় ধুঁয়ো দিই।

বিরাং সিগারেট কেনে না, কুটুম্বরা দিয়ে যায়, হাতেম জানে। রাতের কুটুম্বরা নিশ্চয় দিয়ে গেছে।

বিরাং একটু হেসে বলল, খেয়ে তো সহ্য হবে না। খালি কেশে মরবে!

তোমার চেয়ে? হাতেম পাকা দাড়িতে হাত বুলিয়ে হা হা করে হাসে। তারপর সিগারেট পেলে খুশি হয়ে ফের বলে, দাঁড়াও মিতে। বুদ্ধিটা সাফ করে নিই। তারপর বলছি।

দুজনে সিগারেট টেনে এবং প্রচুর কেশে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে সকৌতুকে হাসে। দুটি আদিম মানুষ কত বছর ধরে এমনি মুখোমুখি বসে কত সাংঘাতিক 'সমিস্যের' জট ছাড়িয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে হাতেম বলে, আমি বলি কি মিতে, দাসুকে সঙ্গে

নিয়ে যাব।

কাকে? ভুরু কুঁচকে বিরাং তীক্ষ্ণ দৃষ্টে তাকায়।

দানেশ শালাকে। হাতেম চাপা গলায় বলে। দানুর নিজের লোক আছে আমিনগঞ্জোতে। ও ওদিকটা খুব ভাল চেনে, বুঝলে খামরু মিতে? ওপারের পুলিশের সঙ্গেও ভাল জানাশোনা আছে।

বিরাং গুম হয়ে থাকে।

হাতেম বলে, টাকার ভাগ লাগবে। তাছাড়া সে হয়তো কুটুম্বদের কাছে আলাদা আদায় করেও ছাড়বে। শালা একেবারে শয়তানের ধাড়ি। তবে ঘাঁতঘোঁতটা ভাল জানে।

বিরাং বলার মধ্যে বলে, না।

ক্যানে হে মিতে? আমাদের ক্ষেতিই বা কী বল?

বিরাং আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে, মিতেভাই, তোমার এ বুদ্ধিটা সুবিধের না।

ক্যানে?

ক্যানে? চোখ জ্বলে ওঠে বিরাং খামরুর। দানু পাটোয়ারীজীর মাল ধরিয়ে দিয়েছিল না? পাটোয়ারীজী শুনলে আমাদের ওপর ক্ষেপে যাবেন। ও হয় না হে! অন্য কথা ভাব।

হাতেম দমে যায়। বলে, তাও বটে। মনে ছিল না কথাটা।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকে দুজনে। তারপর বিরাং বলে, আমিই যাব।

হাতেন অবাক হয়ে যায়। খুশিও হয়। কতকাল পরে রাতের অভিযানে বিরাং খামরুকে সে সঙ্গে পাবে। বিপদসঙ্কুল পাড়িতে বিরাংয়ের ওপর তার বড় ভরসা। তাছাড়া বিরাং ওই রুটটা চেনে। সে বলে, এই একটা কথার কথা বলেছ, খামরু। তখন তোমাকে অতবার বললাম না? তোমাকে সঙ্গে পেলে আমি দুনিয়ার কাকেও পরোয়া করি নে মিতে।

বিরাং চুপ করে থাকে। হাতেম ফের বলে, মহিষমারা চরের মাথায় একটা সেপাই হঠাৎ কোত্থেকে মাটি ফুঁড়ে গজিয়েছিল

সেবারে, মনে আছে? সেই যে।

বিরাং অস্পষ্ট স্বরে বলে, হুঁ।

তোমার সাহস আছে খামরু। তুমি পাশে ছিলে বলে আচমকা হেঁসোর কোপ ঝেড়ে…

চুপ! বলে বিরাং এদিকে ওদিকে তাকায়। সেই সাংঘাতিক ঘটনাটা মাঝে মাঝে তার মনে পড়ে যায়। শুধু দুজনেই জানে, পদ্মার এক দুর্গম চরে একটা সেপাইয়ের লাশ পোঁতা আছে। তার বন্দুকটা হাতেম পরে ওপারের এক সাঙাৎকে বেচেছিল। তারপর কী হল কে জানে।

হাতেম চমকে উঠেছিল। বিরাং বলে, দেওয়ালের কান আছে। ওকথা ভুলে যাওয়াই ভাল।

হাতেম সায় দিয়ে বলে, ঠিক, ঠিক।

আরও কিছুক্ষণ কথা বলে বিরাং বেরুল। হাতেমরা নৌকো নিয়ে চেকপোস্ট এড়িয়ে ডোমনীগড়ার বিল ঘুরে এক গোপন পথে পীরের চরে পৌঁছবে। অনেক নৌকোর ভিড়ে তারা নৌকো রাখবে। বিরাং যাবে তীর্থযাত্রীদের কোনও দলের সঙ্গে চেকপোস্ট হয়ে। ক্যাম্পে গিয়ে সে ব্যবস্থা করে নেবে সে। পীরের চরে যেতে তার অসুবিধে নেই। হাবিলদারজীকে একটু ধরলেই হলো। তবে সে একা গেলে সন্দেহ হতে পারে অনেকের। তাই মেয়েকেও সঙ্গে নেবে। বলবে, মেয়ের অসুখ সারাতে মানত মেনেছিল। শিন্নি চড়াতে যাচ্ছে।…

বিকেলের মধ্যেই ক্যাম্পে গিয়ে হাবিলদারজীকে ধরে ব্যবস্থা সেরে নিল বিরাং। চেকপোস্টের ওখান হয়ে যে সেপাইরা সারা রাতের জন্মে টহলদারিতে যাবে, তারা চেকপোস্টে বিরাং আর তার মেয়ের কথাটা বলে রাখবে। হাবিলদারজী তাকে আশ্বস্ত করে বললেন, কুছু অসুবিস্তা হোবে না।

তা হওয়া উচিত নয়। দশটা টাকা খরচ হলো যখন।

বিরাং সবাইকে দেখিয়ে-দেখিয়ে বাজারে শিন্নির জন্মে নতুন

মাটির সরা, বাতাসা, ধূপকাঠি, একখানা নতুন গামছা ইত্যাদি কেনাকাটা করল। গোটাকতক মাটির ঘোড়াও কিনল। থানে ঘোড়াগুলোও দিতে হয়। বাজারে এখন এসব শিন্নির জিনিসপত্র এনে রাখে দোকানদার।

বাড়ি ফিরে বিরাং ডাকে, ও জবা! এগুলো ধর দিকি মা!

জবা অবাক। ও কী আনলে?

বিরাং চোখ নাচিয়ে বলে, শিন্নি চড়াতে যাব আমরা পীরের চরে। চল না, থানের মেলা দেখিনি। তুই তো দেখিস নি কখনো। দেখে আসবি।

জবা সঙ্গে সঙ্গে খুশি হয়েছে। ইরানীরা গিয়েছে। হরবোলাদা গিয়েছে। তারও যেতে ইচ্ছে করেছিল। কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারে নি। সে চঞ্চল হয়ে ছোটাছুটি করে। শেষে বলে, কিন্তু ও বাবা, বাড়িতে কে থাকবে?

পাঁচুর মাকে খবর দে। বিরাং শান্তভাবে বলে। দরজায় তালা দিয়ে যাব। ও বারান্দায় চট টাঙিয়ে শোবে। খাটিয়াটা আছে। অসুবিধে হবে না।

শচী অবস্থা দেখে খুশি হয়েছে। আজ অনেক লোক এসে গেল বেলা যেতে যেতে। এখানে ওখানে অনেক নৌকোর ভিড়। কারা এপারের, কারা ওপারের চেনা যায় না। একই রকম মানুষ সব। কাঁপতে কাঁপতে স্নান করছে। শিন্নি চড়াচ্ছে। ফকিরের দল সারাক্ষণ ঢোল বাজিয়ে গান চালিয়ে আর মাঝে মাঝে ছিলিম টানছে। আজ খালের সামনেটা কাদায় আরও থক থক করছে।

আরও অনেক দোকানপসার এসে গেছে। তবে এবার নাকি সাতদিনের ধুম নয়, মোটে তিনদিনের। তা হোক। শচীর তর সইছিল না। দুপুরে এক পেট মুরগির মাংস আর ভাত খেয়ে একটু ঘোরাঘুরি করে সে জায়গা বেছে নিয়েছিল। তারপর একদফা আসর বসিয়েছিল। টাকা তিনেক পড়েছে রুমালে। লোকেরা তার

পাখপাখালি জন্তু জানোয়ারের ডাক শুনে অবাক হয়েছে। খুব আগ্রহ নিয়ে শুনেছে। ফরমাস করেছে। হেসে গড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু একটানা বেশিক্ষণ 'ফাংশান' করা যায় না। গলা ব্যথা করে। শচীর দম ফুরিয়ে যায়। তাই জিরিয়ে নিতে আসর গুটিয়ে ফেলেছে তখনকার মতো।

ইরানীরা চট টাঙিয়ে তাঁবুর মতো করেছে। সেখানে ফিরে দেখল, তুরানী একা গুম হয়ে বসে আছে। শচী বলল, কী ব্যাপার? দিদি কোথা?

তুরানী বাঁকা মুখে বলল, কে জানে!

শচী সামনে পা ছড়িয়ে বসল তালাইয়ের ওপর। ক্লান্তভাবে বলল, একটুখানি জল খাব তুরানী। গলা চিরে গেছে মাইরি!

তুরানী এনামেলের হাঁড়িতে রাখা পদ্মার জল একটা প্ল্যাস্টিকের গেলাসে ঢালে। এগিয়ে দিয়ে বলে, গলা ব্যথা করে তো ওসব না করলেই হয়!

শচী জল নিয়ে একটু হাসে। তোমাদের প্যাণ্টের দাম শুধতে হবে না?

তুরানী ওর জল খাওয়া দেখে। তারপর বলে, হরবোলাদা, বুবু তোমাকে প্যাণ্টের দাম কত চেয়েছে গো?

শচী বলে, কেন? আগেরটাতে যা দিয়েছি, তাই দেব বলেছি।

তুরানী চাপা গলায় বলে, বারো টাকার বেশি দিও না। ভারি একটা প্যাণ্ট দেবে তোমাকে তাও লাভ করবে। জান হরবোলাদা, বুবুর মনটা খুব ছোট।

শচী অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। বেলা পড়ে আসছে। রাতে আবার একদফা 'ফাংশান' কীভাবে করবে, সেই কথা মাথায় ঘুরছে। আজ রাতে দোকানপাটে হ্যাজাগ বা কারবাইড বাতি জ্বলবে সে দেখে এসেছে। সেই আলোতে চালাতে হবে। কিন্তু ঝোঁকের মাথায় মোরগ ডাকাটা বেশি হয়ে গেছে। গলা চিন্ চিন্ করছে। কেমন হবে বুঝতে পারছে না।

তুরানী ফের চাপা স্বরে বলে, এই হরবোলাদা। বুবু এখানে কেন এসেছে জানো? তোরাপভাইয়ের টানে। একটু আগে তোরাপভাই এসে ওকে ডেকে নিয়ে গেল। এতক্ষণ দুজনে কোথায়…

সে লজ্জায় হঠাৎ চুপ করে যায়। শচী হেসে ওঠে। বলে, খুব ভাল কথা। তোমার হিংসে হচ্ছে বুঝি?

যাঃ! জুয়াড়ী-টুয়াড়ী দেখলেই আমার ঘেন্না হয়। তুরানী মুখ নামিয়ে বলে। আর তোরাপভাইকে তো তুমি চেনো না। বড্ড হারামী লোক। আমার দু'চক্ষের বিষ। বুবুর সর্বনাশ করে তবে ছাড়বে।

শচী হুঁ্যা হুঁ করে যাচ্ছিল, কিন্তু তার মন পড়ে আছে পরের দফা কীভাবে 'ফাংশান' করবে। সে আনমনে এদিক ওদিক তাকায়। তুরানী তোরাপের বিরুদ্ধে একনাগাড়ে বক বক করতে থাকে। তার মধ্যে একবার শচীর মাথায় আসে, আসলে ইরানী তোরাপকে বিয়ে করে কেটে পড়লে তুরানী একা কী করবে তাই নিয়ে ভাবনায় পড়েছে। এবার সে বলে, ছেড়ে দাও। মেয়েছেলে চিরকাল কি ব্যবসাবাণিজ্য করে ঘুরে বেড়াবে দেশে দেশে? তোমাকেও তো বিয়েটিয়ে করে ঘরসংসার করতে হবে।

তুরানী কেন যেন জ্বলে ওঠে। ঝাঁঝালো স্বরে বলে, ঝাঁটা মারো। আমার ওসব ভাল্লাগে না।

তবে কী ভাল্লাগে শুনি? এমনি করে বোঁচকা নিয়ে ঘুরতে?

হুঁ। তুরানীর ঠোঁটে একটা শক্ত রেখা ফোটে। তার মুখে সংকল্প আর বিশ্বাসের ভাব খেলা করে। সে বলে, বুবু ঠকেও শেখেনি—স্বামীর ঘর করা কী জিনিস।

সকৌতুকে শচী বলে, বিয়ে না করেও তুমি কীভাবে শিখলে তুরানী?

তুরানী কী জবাব দিতে ঠোঁট ফাঁক করেছিল, সেই সময় ভারি গলায় কে বলে ওঠে—ছচী!

শচী চমকে ঘুরে দেখে কয়েক মুহূর্ত ফ্যালফ্যাল করে তাকায়।

তারপর চেঁচিয়ে ওঠে—জয় বাবা পীরসায়েব! খামরু জ্যাঠা এলে তাহলে? কী মুশকিল, আমি বুঝতেই পারি নি। কী কাণ্ড দেখ দিকি।

বিরাং খামরু জায়গাটা দেখে নিয়ে বলে, ভালই। হ্যাঁ রে তুরানী, তোর দিদি কোথা?

তুরানী বলে, বেরিয়েছে। তা হ্যাঁগো খামরুকাকা, এলে যখন জবাকে আনলে না কেন বাপু?

বিরাং একটু হেসে বলে, জবা এসেছে। ওর তাগিদে পড়েই আসা। ওখানে নৌকোর কাছে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তোদের খুঁজতে এলাম। বাপস! অত কড়াকড়ি বলছে, এদিকে লোকের ভিড় আগের মতই।

শচী বলে, জবা কোথায়? তারপর পা বাড়ায়। বিরাং আঙুল তুলে নীচের চরটা দেখিয়ে দিলে সে দৌড়তে শুরু করে! বিরাং বলে, তাহলে তোদের এখানেই আমাদের ডেরা পাতি। না কী রে মা?

তুরানী খুশি হয়ে বলে, হ্যাঁ খামরুকাকা! এখানে তত হাওয়া লাগবে না। মাথার ওপরে চট টাঙাবারও অসুবিধে নেই। কত ঝোপঝাড় দেখছ তো? একটু সাফ করে নিলেই হবে। তা আমি এক্ষুনি হাত লাগাচ্ছি। তুমি পাটকাঠি যোগাড় করো এখুনি। ওদিকে বেচছে দেখো গে।

বিরাং জিনিসপত্র আনতে যায়। শচী ততক্ষণ জবার কাছে হাজির। দিন শেষের আলোয় ঘরে দুজনকে মুখোমুখি দেখে হঠাৎ কী মনে আসে বিরাংয়ের, একবার থমকে দাঁড়ায়। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকে। তারপর একটা ভারি নিশ্বাস ফেলে সাবধানে ঢালু বেয়ে নেমে যায়। পায়ে দাতোয়ার শিংয়ের বুটজুতো। এসব জায়গায় জুতো দুটো খুব কাজ দেয় বটে।...

॥ পাঁচ ॥

নো ম্যানস ল্যাণ্ডের সে রাতে অন্য এক রূপ। চারপাশে পদ্মার বুকে অন্ধকার আর কুয়াশা, এখানে বিচ্ছিন্ন এক কালো দ্বীপের মত চরে অজস্র আলোর বুদ্বুদ। দূর থেকে মনে হবে নক্ষত্রের দেশ থেকে অজস্র জিনপরীরা পাখনা মেলে নেমে গেছে পৃথিবীর একটুকরো মাটিতে, যার মালিক স্বয়ং ঈশ্বর ছাড়া কেউ নয়।

জবা আর তুরানী সন্ধ্যা থেকে ঘুরে বেরিয়েছে। মান্নুতে স্নান আর গড়াগড়ি দেখেছে। থানের ধারে জবা সেই মাটির ঘোড়াগুলো আর শিন্নি রেখে প্রণাম করেছে। তারপর ঢুকেছে দোকান পসারের ভিড়ে। পাটকাঠি, খড় আর চটের দোকানে। মনোহারিওলারা এসেছে। এসেছে তেলেভাজা চানাচুরওলারা। দুটো সন্দেশের দোকানও এসেছে লালগোলা থেকে। ওরা বেঞ্চে বসে রসগোল্লা খেয়েছে। সেই সময় শচীর 'ফাংশান'ও চলেছে ওপাশে কোথাও। তার গলাটা একটু চিড় খাওয়া। তবু উৎসাহের চোটে সমানে চেঁচিয়ে লোক জড়ো করেছে।

ভাইরে ভাই! দাদা রে দাদা! শুনুন তবে বলি এই কলিকালের কথা। শচী হাতে বারকতক তালি দিয়ে বলতে থাকে।...কী কথা বলি? বলতে হে ভয় করে, কী জানি কোমরে দড়ি বেঁধে জেলখানা পোরে। তারপর ফিক করে জোকারের হাসি হাসে শচী। হঠাৎ গলা চড়িয়ে দেয়—না, না, না। ভয় কিসের, কাকেই বা ভয়? এ ভাই এমন ঠাঁই, যার নাকি মালিক নাই।

ছন্দে মিলিয়ে ছড়ার ভঙ্গীতে শচী বলতে থাকে ফের, নো ম্যানস লেণ্ড। কথার মানে সবাই জানেন ফ্রেণ্ড। (ল্যাণ্ডকে সে লেণ্ড উচ্চারণ করে।) তাই আজ সাহস করে সত্য কথা বলি। জেণ্টলমেন! ভ্রাতাভগ্নী, বালকবালিকা, বুড়োবুড়ি, রোগারুগী, কানাখোঁড়া! সবাইকে আমার কোটি কোটি নমস্কার! আরও কোটি

নমস্কার পীরবাবার চরণে।

ভিড়ের লোকেরা হেসে খুন হয়। শচীকে ঘিরে ধরে। শচী একটু ঠেলে চারপাশের ভিড় সরিয়ে মধ্যিখানটা ফাঁকা রাখে। আবছা আলো তার মুখে পড়েছে। দোকানপারের হ্যাজাগ আর কারবাইড বাতির জেল্লা থেকে ছিটকে গেছে আলোটুকু। তার মুখে বিব্রত ও বিদূষকের যুগপৎ ছবি ফুটে উঠছে। সে বক্তৃতার ভঙ্গীতে বলে, কী তবে আমার সত্য কথা ? না, পেটের জ্বালায় মানুষ করল বন কেটে বসত। বাঘ ভাল্লুক সিংহ শেয়াল হাতি ঘোড়া জন্তুজানোয়ার হলো নির্বংশ। পাখপাখালি সাপব্যাঙ পোকামাকড় গিরগিটি টিকটিকি সেখানে যা ছিল, ফলিডল ইত্যাদি প্রভৃতি বিষ ইউজ করে শেষ করে ফেলল মানুষ। বটে কি না ?

ভিড় সায় দেয়, বটেই তো! বটেই তো!

শচী চিৎকার করে ওঠে, না, না, না। জন্তুজানোয়ার পাখপাখালি পোকামাকড় নির্বংশ হয় নি গো হয় নি। সেটাই আমার গোপন কথা। এই নো ম্যানস লেণ্ডে সাহস করে বলি তবে শুনুন। সব আমার বুকের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। লুকিয়ে রেখেছি গো, লুকিয়ে রেখেছি। আহা, ভগবানের জীব বলে দয়া করে এই বুকের মধ্যিখানে রেখে দিয়েছি। বিশ্বাস হচ্ছে না ? তবে শুনুন। প্রথমে শেয়াল-গুলোকে ডেকে দিই। এই ভাই ভুঁড়শেয়াল! আখের ক্ষেতের পাশ থেকে যেমন করে সন্ধেবেলা গান গাইতে—গাও দিকি ভাই!

সে শেয়াল ডাকতে শুরু করে। ভিড় অবাক হয় শোনে। কিছুক্ষণ চুপ করে যায়। তারপর হাসিতে ভেঙে পড়ে।

একের পর এক জন্তুর ডাক শোনায় শচী। জমে ওঠে আসর। বেড়ালের ঝগড়াও শুনিয়ে দেয়। তারপর পাখপাখালির ডাক শুরু করে। মোরগের ডাক শোনাতে সে একটা গল্পও জুড়ে দেয়। করিম মোল্লা একটা মোরগ ঘুষ দিয়েছিল দারোগাবাবুকে। সেই মোরগ কীভাবে পালাল। কত হাত ঘুরে আবার দারোগাবাবুর হাতে ফিরে গেল এবং মারা পড়ল, সেই গল্প।

সবশেষে ঘুঘু পাখির ডাক। নিঃঝুম দুপুরের পাড়াগাঁয়ে মনকে উদাস করা ডাক ঘু ঘু ঘু—ঘু ঘু ঘু! ভিড় স্তব্ধ হয়ে শুনল।

এটাই খুব দরদ দিয়ে ডাকে শচী। চমৎকার নকল করেছে বটে।

জবা ও তুরানী একটু শুনে হাসতে হাসতে দরবেশ বাবার আসরে ফকিরদের গান শুনেছে কিছুক্ষণ। তারপর তাদের আড্ডায় ফিরে গেছে। ইরানীর পাহারা দেওয়ার কথা। নেই। বিরাং একা রান্না করছে।

বিরাং বলে, মেলা দেখা হলো তোদের?

জবা বলে, ভারি এতটুকু মেলা! আমি ভেবেছিলাম, না জানি কী ব্যাপার!

বিরাং হাসে—তাই বটে। তো জবা, তুই দ্যাখ মা খেঁচুড়িটা। আমি একবার ঘুরে আসি।

জবা মাটির ঢেলার উনুনে পাটকাঠির গোছা ঠেলে দেয়। তুরানী নিজেদের জায়গায় চুপ করে বসে থাকে। বিরাং চলে গেলে জবা বলে, তোকে মনমরা দেখাচ্ছে কেন রে?

তুরানী বলে, কিছু না। বড্ড জাড় লাগছে।

এখানে এসে বস না।

থাক। বলে তুরানী তুলোর একটা কম্বল ভাল করে জড়িয়ে নেয়।

জবা বলে, রাতে তোরা রাঁধবি নে তুরানী?

না রে। ও বেলা রেঁধে রেখেছে বুবু। হয়ে যাবে।

তুরানী?

উঁ?

তোর দিদি একা ঘুরে বেড়াচ্ছে কোথায় বল তো? দেখতে পেলাম না!

তুরানী আস্তে বলে, আবার কোথা? তোরাপদার সঙ্গে আছে কোথায়।

জবা কিছুক্ষণ চুপচাপ আগুনে হাত সেঁকে। তারপর বলে, জুয়াড়ীদের আসর কখন বসবে রে?

তুরানী বাঁকা মুখে জবাব দেয়, কে জানে! তারপর একটু হাসে। চোখ নাচিয়ে বলে, ক্যানে? তুই জুয়ো খেলবি নাকি?

যাঃ!

তুরানী চাপা গলায় বলে, এই! জানিস? আমি একবার ফতেপুরের মেলায় বুবুকে লুকিয়ে জুয়ো খেলেছিলাম। এক আনা ফেললাম ছকে। দু'আনা পেয়ে গেলাম। অমনি পালিয়ে এলাম। সে অনেক বছর আগে। জবা, খেলবি তুই?

জবা মাথা দোলায়। বলে, বাবা টের পেলে কেটে ভাসিয়ে দেবে পদ্মায়। বাবার খুব রাগ জুয়াড়ীদের ওপর। আমাদের নাকি অনেক জোতজমা ছিল। ঠাকুর্দা জুয়ো খেলে সব ঘুচিয়ে দিয়েছিল।

তুরানী বলে, আরে না না! দু'চার আনা খেলব। বেশি না।

জবা একটু দ্বিধায় পড়ে যায়। জুয়া ব্যাপারটা তার কাছে ভারি রহস্যময়। একবার হাতেনাতে পরখ করে দেখতে ইচ্ছে করে, তার বরাতটা কেমন। অথচ বাবাকে তার বড্ড ভয়।

তুরানী বলে, হরবোলাদাকে সঙ্গে নেব। কেউ জানতে পারবে না। বুবু আসুক না, তোর রান্নাটাও হয়ে যাক। তারপর হরবোলাদাকে গিয়ে ধরব। কেমন?

জবা ভাবতে থাকে।

তুরানী তাকে ফিসফিসিয়ে প্ররোচিত করে, একবার শুধু। বরাতটা দেখে নিবি, দোষ কী? এখানে দেখবি, কত সব ধিঙ্গি মেয়েও জুয়োর আসরে খেলতে ঢুকেছে। সবাই খেলে।

জবা বলে, সত্যি?

নিজের চোখে দেখবি। আমরা কত মেলায় হাটেবাজারে ঘুরে বেড়াই। দেখছি নে বুঝি?

শচীর গলার অবস্থা এবার আরও খারাপ। ঠাণ্ডা জল খেয়ে একটা সন্দেশের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে গলায় হাত বুলোচ্ছে, বিরাং এসে দাঁড়াল। এই যে শচী! কেমন হলো বাবাজীবন?

শচী হাসে।...গোটা সাতেক টাকা কুড়িয়েছি খামরু জ্যাঠা। আরও কিছুক্ষণ চালাতে পারলে আরও হতো। গলায় গণ্ডগোল। এস, চা-ফা খাই।

বিরাং তার হাত নিয়ে চাপা গলায় বলে, এদিকে এস ছচী। একটু কথা আছে।

ভিড়ের বাইরে তাকে নিয়ে চলে বিরাং। ঝোপজঙ্গলের ফাঁক দিয়ে অন্ধকারে ঢালু বেয়ে নামতে থাকে। নীচের বালির চড়ায় পৌঁছে সে বলে, আজ রাতে আমি একটু ওপারে রওনা দিচ্ছি, বুঝলে ছচী? দরকার আছে। তুমি জবাকে দেখো। যদি তেমন কিছু হয়, তাহলে...

শচী চমকে ওঠে।...খামরু জ্যাঠা! নাই বা গেলে?

বিরাং চুপ করে গেছে। সে অন্ধকারে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। কুয়াশার ফাঁকে দু' একটা নক্ষত্র জুলজুল করছে সেদিকে। একটু পরে সে বলে, যেতে হবে। হাতেমমিতে রাস্তা চেনে না! তবে নারাঙ্গার চর অব্দি গেলেই হবে। তারপর আমরা ফিরে আসব। যদি না ফিরি...

ফের তাকে চুপ করতে দেখে শচী বলে, তাহলে?

বিরাং ঘড়ঘড়ে গলায় বলে, তুমি বামুনের ছেলে ছচী। আমি শুদ্দুর। কিন্তু তোমার মনটা খুব বড় বাবা। জানি বলেই বলছি! আর ছচী, একদিন তুমি কথায়-কথায় বলেছিলে, মানুষের ছোট বড় নাই। জাতবেজাত নাই। তাই কিনা সবার হাতে খাও। বিচার-আচার করো না।

শচী আস্তে বলে, হ্যাঁ খামরু জ্যাঠা। আমি জাতটাত মানিনে।

হঠাৎ বিরাং তার দু'হাত ধরে বলে ওঠে, আমার জবাকে তুমি নেবে ছচী? খুব ভাল মেয়ে। তোমার এতটুকুন অভাব অসুবিধে হতে দেবে না। সবদিকে ওর নজর। ওর ভার তুমি নেবে বাবা?

শচী হতবাক হয়ে অন্ধকারে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। বিরাংয়ের গলায় চাপা কী একটা শব্দ হচ্ছে। বুড়ো কী কাঁদছে? কেন হঠাৎ এসব কথা এতদিনে—নিরিবিলি পদ্মার চরে ডেকে এনে?

শচী কাঁপাকাঁপা গলায় বলে, জ্যাঠা! তুমি এসব কথা কেন বলছ বলো তো?

খামরু কম্বলের খুঁটে চোখ মোছার ভঙ্গী করে বলে, কে জানে! আমার কেমন গা বাজছে রে বাবা! মনে হচ্ছে, কী জানি কী বিপদ-আপদ যদি হয়, হতভাগা মেয়েটা একা বড় বিপদে পড়ে যাবে। ওর বিনোদীঘির মাসিও যদি বেঁচে থাকত, অসুবিধে ততটা হতো না। ছচী, তুমি নেবে না আমার মেয়েকে?

শচী এবার হাসবার চেষ্টা করে।··খামরু জ্যাঠা! তোমার মেয়ের ভার আমার। কিন্তু তুমি বিপদের কথাই বা ভাবছ কেন? যদি ভাবছ, তাহলে যাচ্ছই বা কেন?

বিরাং বলে, না গেলেও বিপদ। আমার উপায় নাই ছচী। যেতেই হবে।

জবাকে বলেছ তো?

না। এখনও বলি নি।···বিরাং চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।···শুনে কান্নাকাটি জুড়ে দিলেই মুশকিল। ভয় পেয়ে যাবে কি না! একা পীরের চরে···অবশ্যি তুমি আছ!

শচী একটু চুপ করে থেকে বলে, হ্যাঁ, আমি থাকছি। জবার জন্যে ভাবতে হবে না তোমাকে। তবে···

বিরাং আগ্রহে বলে, তবে কী বাবা ছচী!

কিছু না। বলে শচী শুকনো হাসে। ফিরে এস ভালয় ভালয়। তখন দেখা যাবে। পীরবাবার নাম করে বেরিয়ে তো পড়ো!

বিরাং হঠাৎ কেমন রূঢ় গলায় বলে ওঠে, ছচী! জবাকে তুমি নেবে কিনা বলো।

শচী অবাক হয়। বিরাং খামরু অন্ধকারে মস্ত দানোর মত তার সামনে দাঁড়িয়ে এ কী কথা বলছে তাকে। এই মতলব নিয়েই কি সে তাহলে ঘড়িটা দিয়েছিল? এতদিন স্নেহ আত্যি খাতিরের পিছনে তাহলে ওই অদ্ভুত উদ্দেশ্য ছিল বুড়োর? না—শচী জাতটাত মানে না। ওসব কোনও সংস্কার তার মধ্যে এতটুকু নেই। ছেলেবেলা

থেকে ছত্রিশ জাতের হাতে খেয়ে বেড়িয়েছে। কিন্তু যা সে কল্পনাও করে নি কোনদিন, জবাকে অন্য চোখে মুহূর্তেও দেখেনি—তাই সামনে তুলে ধরেছে বিরাং খামরু।

বিরাং ফের বলে, ছচী! জবাব দাও কথাটার!

শচী ভয় পেয়ে গেছে। মিনমিনে গলায় বলে, আমার আপত্তি নেই জ্যাঠা। কিন্তু তোমার মেয়ের কি আমাকে পছন্দ হবে?

এবার একটু ভড়কে যায় বিরাং। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকে। তারপর বলে, তুমি একটু দাঁড়াও এখানে। খবর্দার ছচী! কোথাও চলে যেও না। আমি এক্ষুনি আসছি।

সে থপ থপ করে হাঁটতে থাকে। উঁচুতে ওঠার সময় বালি-মেশানো মাটির চাঙড় এসে পড়ে। সে ঝোপ আঁকড়ে হিংস্র জন্তুর মত উঠতে থাকে।

শচী উদ্বেগে অস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর একটা সিগারেট ধরায়। বড় অদ্ভুত সমস্যায় ফেলে দিল তো বিরাং বুড়ো! এক্ষুনি ঘড়িটা হাত থেকে খুলে ছুড়ে দিয়ে চলে যাবে নাকি পীরের চর থেকে? তারপর হঠাৎ তার সামনে জবার মুখটা ভেসে ওঠে। একটু লোভ জেগে ওঠে এতদিনে।

কিন্তু বাবার অদ্ভুত প্রস্তাব শুনে জবা কী করবে সে ভেবেই পাচ্ছে না। শচী বিড় বিড় করে বলে, পাগল! পাগল! নির্ঘাৎ বিরাং খামরুর মাথায় গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে।

তারপর শচীর হঠাৎ মনে পড়ে যায়, ঘড়ির জন্যে জবার মনে কষ্ট হয়েছে। তার স্বামীর জন্যে কেনা ঘড়ি শচীকে দিয়েছে বলেই তো! বোঝা যায়, জবার মনে তার মরে যাওয়া স্বামীটার জন্যে এখনও প্রচুর ভালবাসা আছে।

শচী এদিক ওদিক তাকায়। একটু দূরে নৌকোর ঝাঁকে আলো জ্বল জ্বল করছে। অনেকে ফিরে যাচ্ছে তীর্থের মানত সেরে। চণ্ডীতলার ওদিকে কি কোনও নৌকো ফিরে যাচ্ছে না?

মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শচী পা বাড়ায়।

সে জানে, বিরাং খামরু বেঁচে থাকতে আর চণ্ডীতলার এ তল্লাটে সে আসতে সাহস পাবে না। তবু এই বিপদ থেকে তাকে বাঁচতেই হবে। শচী নৌকোগুলোর দিকে হন্তদন্ত এগিয়ে যায়। ব্যাগটা পড়ে থাকল জবাদের ওখানে। থাক্ গে। তার বদলে ঘড়িটা না-হয় জিম্মায় রইল। পরে চিঠি লিখে জবাকে জানাবে—ঘড়ি ফেরত দেব। ইরানীদির হাতে আমার ব্যাগটা দিও। ব্যস!

তাড়াখাওয়া সত্যিকার শেয়ালের মত শচী পালাবার জন্যে অন্ধকার বালিয়াড়িতে প্রায় দৌড়তে শুরু করে।

বিরাং খামরুকে কী যেন ভর করেছে। তার চাউনি জ্বলজ্বলে, মুখের ভাবে কাঠিন্য। ইরানীকে দেখে সে হাঁফাতে হাঁফাতে বলে, জবা কোথায় গেল ইরানী?

ইরানী হাসিমুখে বলে, এক্ষুনি তুরীর সঙ্গে আবার মেলায় বেরুল। আমি আসতেই বলল, বেরুব। তা আমি দেখলাম, চুপচাপ ঠাণ্ডায় বসে কী করবে। যাক্ না। গানবাজনা শুনুক। ভারি ভাল গাইছে খামরুকাকা।

বিরাং তক্ষুনি মেলার দিকে পা বাড়ায়।

সে হন্তদন্ত হয়ে খুঁজে বেড়ায় ভিড়ে। কোথায় গেল ওরা? থানের ওপাশে দরবেশের ঘরের সামনে গানের আসরে মেয়েদের ভিড় আছে। সেখানে জবা বা তুরানী নেই। বিরাং ক্ষেপে যায় ক্রমশ। থানের চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে লোকেদের রাতের আস্তানা গড়ে উঠেছে। আগুন জ্বলছে এখানে-ওখানে। বিরাং সেদিকে পা বাড়াতে গিয়ে ফিরে আসে। ওখানে কেন যাবে ওরা?

সে থপ-থপ করে ভারি পা ফেলে হেঁটে বেড়ায়। মিলিটারী বুটজুতোর তলায় কাদা জমেছে। ভুতুড়ে কী এক শক্তি যেন ক্রমশ তাকে পেয়ে বসেছে। এবার সে ভাঙা গলায় ডাক দেয়—জবা!

পদ্মার দিকে প্রতিধ্বনি ওঠে। আবার সে হিংস্রভাবে চিৎকার করে ওঠে—জবা! মেলার শব্দ ছাড়িয়ে তার ডাক কিছুদূর এগিয়ে

যায় এবং অন্ধকারে কুয়াশায় শিশিরে যেন নেতিয়ে পড়ে।

হঠাৎ বিরাংয়ের খেয়াল হয়, জুয়াড়ীদের আসর বসার সময় হয়ে এল। তুরানী জবাকে নিয়ে তোরাপ জুয়াড়ীর কাছে গিয়ে আড্ডা দিচ্ছে না তো ?

কিন্তু সেও খুঁজে বের করা মুশকিল। জুয়াড়ীরা তীর্থযাত্রীদের ভিড়ে গা ঢাকা দিয়ে বসে আছে। বিরাং ডাকতে ডাকতে ঝোঁকের মাথায় পা বাড়াল। তারপরই সে খাড়া চরের বালিয়াড়ি থেকে পা হড়কে গড়াতে গড়াতে নীচে গিয়ে পড়ল। আহত জন্তুর মত হুঙ্কার দিয়ে কম্বলটা আবার সে ঝেড়েঝুড়ে গায়ে জড়াল।

সেই সময় কোথায় একটা গণ্ডগোল হচ্ছে, আবছা কানে এল তার। পীরের চরের দক্ষিণে কারা চেঁচামেচি করছে। বিরাং কান পেতে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করে। এ চরে কোনও দেশেরই পুলিশ বা মিলিটারী নেই। হাঙ্গামা হলে যে যার নিজের প্রাণ বাঁচাবে, এটাই রেওয়াজ। পীরের চরের ভালমন্দের দায়িত্ব যার-যার। আসার আগে সবাইকে সেটা বুঝিয়ে দেওয়া হয়। আগে কয়েক বছর দু'দেশের সরকারী অফিসার এবং পুলিশ মিলে যৌথ দাড়িত্বে এখানে একটা ফাঁড়ি বসানো হতো মেলার সাতটা দিনের জন্যে। সম্প্রতি দু-তিনবছর সেটা আর দেখা যাচ্ছে না। বিরাং উদ্বেগে অস্থির হলো এবার। একা-একা দুটো মেয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে। তাদেরই কোনও বিপদ হলো না তো ?

চরের দক্ষিণে গিয়ে সে থমকে দাঁড়ায়। সামনে একদল লোক ভিড় করে দাঁড়িয়ে ওদিকে আঙুল দেখিয়ে কী বলাবলি করছে। চেঁচামেচিটা বন্ধ হয়েছে। আরও অনেক লোক ছুটে আসছে পাট-কাঠির মশাল হাতে নিয়ে। বিরাং হাঁফাতে হাঁফাতে জিগ্যেস করে, কী হয়েছে, কী হয়েছে ?

কেউ জবাব দেওয়ার আগেই আলোর ছটায় তার চোখে পড়ে, জলের ধারে ইরানী হিংস্রমূর্তিতে একটা লম্বা কাটারি হাতে নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

বিরাং চেঁচিয়ে ওঠে—ইরানী! কী হল রে?

ইরানী সামনে এসে ধরা গলায় বলে, তোরাপ হারামী তুরীকে তুলে নিয়ে পালাল।

বিরাং থমকে দাঁড়ায়। বলে, তোরাপ! তুরানীকে নিয়ে পালাল তোরাপ?

এবার হু-হু করে কেঁদে ওঠে ইরানী।...আমি একটুও বুঝতে পারিনি ওর মতলব। ও ক্যানে আমাদের পীরের চরে ডেকে এনেছিল, ভাবিনি গো!

বিরাং ব্যাকুল হয়ে জিগোস করে, আমার জবা কোথা রে মা? তার কিছু বিপদ হয়নি তো?

ইরানী পা বাড়িয়ে ভাঙা গলায় বলে, জবাই তো আমাকে খবর দিয়ে ডেকে আনল। তুটিতে তোরাপ হারামীর কাছে গিয়েছিল। বাঘের মুখে পড়তে গেল হতভাগী গো! এখন আমি কী করব? সে এক হাতে চুল আঁকড়ে ধরে। তারপর ভেঙে পড়ে কান্নায়।

বিরাং ফের জিগ্যেস করে, জবা কোথা বলবি তো ইরানী?

ইরানী হঠাৎ গর্জন করে বলে, দেখ গে না, যেখানে থাকবার সেখানে আছে! আমার মাথায় এখন আগুন জ্বলছে। তোরাপের খুন আমি না দেখি তো হাতেমের বেটিই নই। এই আমি কিরে করলাম। বাবা পীরসায়েব, সাক্ষী থেকো!

তার প্রতিজ্ঞা আর বিলাপ রাতের অন্ধকারে ছড়িয়ে পড়ে কতদূর। ততক্ষণে তোরাপের নৌকো অনেক দূরে চলে গেছে।

বিরাং আস্তে আস্তে হেঁটে তার আড্ডার দিকে ফিরে চলে। একটু দূর থেকে চোখে পড়ে, উনুনের সামনে বসে আছে জবা। পাটকাঠি গুঁজে দিচ্ছে। আগুনের ছটায় মনে হচ্ছে, মুখটা মরা মানুষের মত খড়িপড়া—ধূসর। বিরাংয়ের হঠাৎ বড় মায়া জেগে ওঠে মনে।

সে ভারী গলায় ডাকে, জবা!

জবা তাকায়। ঠোঁট দুটো কাঁপে।

বিরাং আস্তে বলে, ভুল করেছিলি মা! ওভাবে যেখানে-সেখানে যেতে আছে? খুব বেঁচে গেছিস।

তারপর সে আঁচে হাত দুটো সেঁকতে থাকে। বয়স হয়েছে বিরাং খামরুর। ক্লান্তিতে অবশ হয়ে সে নিজের ঠাণ্ডা শরীরকে সেঁকে নিতে নিতে শচীর কথা ভাবে। শচীকে দাঁড করিয়ে রেখে এসেছে।

জবাকে নিয়ে তার কাছে যেতে হবে। কিন্তু শরীরটা এত ক্লান্ত। ওদিকে বেচারা শচী ঠাণ্ডায় কতক্ষণ কষ্ট পাবে আর? বিরাং মনে মনে তৈরী হয়ে ডাকে, জবা!

উঁ?

বিরাং কথা বলতে ঠোঁট ফাঁক করেছে, এমন সময় মঙ্গল এল।

মঙ্গল চাপা গলায় বলে, আর কত দেরী খামরুখুড়ো? ফিরতে সকাল হয়ে যাবে যে। গা তোল এবার।

বাবা মেয়ে পরস্পরের দিকে তাকায়।

হঠাৎ মঙ্গল বলে, হরবোলাবাবুর কী হল খামরুখুড়ো? চলে গেল কেন গো? বিরাং লাফিয়ে ওঠে। কী? চলে গেল? তার মানে কী রে মঙ্গল?

মঙ্গল একটু হেসে বলে, কালীতলার মণ্ডলদের নৌকোয় দেখলাম। ওরা ফিরে যাচ্ছে। তোমার হরবোলাবাবুও আছে। আমি জিগ্যেস করলাম। যেন শুনতেই পেলে না।

বিরাং শুধু বলে, ও। আচ্ছা।…

মাস দুই পরে শচী একদিন বহরমপুরে বাসস্ট্যাণ্ডের ওখানে একটা চায়ের দোকানে আড্ডা দিচ্ছে, সেই সময় তার চোখে পড়ল, বগলে একটা বোঁচকা ঝুলিয়ে ইরানী চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে একটা বাসের ছায়ায়। শচী দৌড়ে গিয়ে ডাকল, ইরানীদি যে! কেমন আছ? যাচ্ছ কোথায়?

ইরানী এরই মধ্যে যেন বুড়ি হয়ে গেছে। কেমন পোড়খাওয়া ক্লান্ত চেহারা। শচীকে দেখে সে খুশি হয়ে বলল, হরবোলাদা যে

গো! এসো, এসো।···

শচী জানত না তুরানী হরণের কথা। সব শুনে অবাক হয়ে গেল। ইরানী রাগের চোটে সে রাতেই একটা নৌকো যোগাড় করে চণ্ডীতলায় ফিরে যায়। জবাকেও সঙ্গে নিয়ে এসেছিল খামরুবুড়োর কথায়।

শচী বলল, তাহলে খামরুজ্যাঠা ওপারে শেষ পর্যন্ত গিয়েছিল?

ইরানী বলল, হ্যাঁ। বুড়ো বড্ড জেদী। ওই জেদই তো শেষ পর্যন্ত ওকে মারল।

শচী আঁতকে উঠে বলল, মারল মানে?

কেন? শোন নি?

না তো!

ইরানী একটু চুপ করে থাকার পর বলল, বাপজান ওর সঙ্গে ছিল। জনাই ছিল। মঙ্গলও ছিল। বরাবর যেমন থাকে। নারাঙ্গার চর বলে একটা জায়গা আছে। সেখানে 'কুটুম্ব'দের নামিয়ে দিয়ে ওরা ফিরে আসছে, তখন চাঁদটা উঠেছে। হঠাৎ এক জায়গায় খামরুকাকা বলল, ওই চরে নৌকো বাঁধো তো। কাজ আছে। ওরা নৌকো বাঁধল। তখন খামরুকাকা নেমে গেল। ওরা ভেবেছিল, 'মাঠ সারতে' যাচ্ছে। হঠাৎ পেট বেজেছে অসময়ে। তো···

শচী বলল, তারপর?

ইরানী জানাল, তারপর ওরা বসে আছে তো আছে, বুড়ো ফেরে না। তখন দুচারবার ডাকাডাকি করল। সাড়া পেল না। আরও খানিকটা দেখে মঙ্গল নেমে গেল। মস্ত চর। কিছুদূর খোঁজাখুঁজি করে ফিরে এল সে। ততক্ষণে খুব কুঁয়ো (কুয়াশা) এসে জমেছে। যে বিপদের ভয়ে তাড়াতাড়ি ফিরতে চাইছিল, সেই বিপদ এসে পড়েছে। তার ওপর মুশকিল হয়েছে, রাস্তাও ভাল চেনা নেই বাপজানের। খামরুকাকাই রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে গেছে। এখন ফিরে যে আসবে, তাও পারবে না। এমনি অবস্থা। এদিকে

সকাল অব্দি থাকলে ওপারের পুলিশের পাল্লায় পড়ে যাবে। বোঝ অবস্থা। দেখতে দেখতে কুঁয়োয় একাকার হয়ে যাচ্ছে। দশহাত দূরের কিছু দেখা যায় না চোখে।

শচী শিউরে উঠে বলল, ইস্! সাংঘাতিক বিপদ বটে।

ইরানী সংক্ষেপে বলল, অগত্যা সকাল অব্দি থাকতেই হল, যা থাকে কপালে। কুঁয়ো ভাঙল। রোদ ফুটল। তখন বাপজান আর মঙ্গল চরে নামল। অনেক দূর খোঁজাখুঁজি করার পর বুড়োকে পেল। ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে আছে। আসলে কী হয়েছিল জানো? হঠাৎ কুঁয়ো এসে ঢেকে ফেলেছিল। তাই দিক ভুল হয়ে নৌকোয় ফিরতে পারে নি। ঠাণ্ডায় জমে মারা পড়েছে। আর চরটারও নাকি বদনাম আছে। বাপজান বলছিল।

শচী একটু ভেবে হঠাৎ বলল, খামরু জ্যাঠার পায়ে মিলিটারী জুতো ছিল, তাই না?

ইরানী নড়ে উঠল। হ্যাঁ, মিলিটারী শুনে মনে পড়ল, গতবছর ওই চরেই দুদেশের সেপাইদের খুব যুদ্ধ হয়েছিল বটে। বাপজান সে কথাও বলছিল। খুব গণ্ডগুলে জায়গা।

শচী ভূত বিশ্বাস করে না। আপনমনে বলল, মনের ধাঁধা! থাকগে, জবার খবর কী?

ইরানী চোখে ঝিলিক তুলে বলল, জবা? কী করবে আর? আছে। পাকা গিন্নির মতো রাঁধছে বাড়ছে। বাবার মতো মাঠে মাঠে চাষাদের দাদনের টাকা আদায় করে বেড়াচ্ছে। তা হরবোলাদা, তোমার কথা প্রায়ই বলে। তোমার কী সব জিনিস ফেলে এসেছ নাকি?

এটুকু শুনেই শচী বলে ওঠে, হ্যাঁ। শিগগির গিয়ে নিয়ে আসতে হবে।